ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা ।। ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২২ নভেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করল হাইকোর্ট

কৃশানু মিত্র।। প্রধান বিচারপতি জে এস প্যাটেল এবং বিচারপতি অসীম রায়কে নিয়ে গঠিত কলকাতা হাইকোর্টের দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ গত ১২ নভেম্বর এক ঐতিহাসিক রায়ে যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গো-হত্যাকে সম্পূর্ণ বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছেন। একইসঙ্গে আদালত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী বলি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ পুনরায় বলবৎ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং বখরি-ঈদের দিনে কোনও গো-হত্যার ঘটনা তাদের নজরে এলে তা আদালতকে অবহিত করা এবং আইন-মোতাবেক ব্যবস্থা নেবারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের আইনজীবী এনামুল হক এবং অন্যান্য কয়েকজনের দাখিল করা পি আই এল (ডাইড কেস নং-এ এস টি-৭২৫ অব্ ২০১০ অন ১১।১০।১০)-এর পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করেন আইনজীবী এস এম কুরেশি এবং আইনজীবী জয়দীপ (এরপর ৪ পাতায়)

সন্ত্রাসের সঙ্গে সঙ্ঘকে যুক্ত করার চেষ্টা

প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও সমর্থকদের সন্ত্রাসী-ঘটনায় জড়ানোর জন্য কেন্দ্র ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এজন্য দিল্লীতে বসে নিজেদের গদী বাঁচানোর জন্য ষড়যন্ত্রে উস্কানি দেওয়া চলছে। গত ১০ নভেম্বর লক্ষ্ণৌতে এক ধর্না ও প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন, সঙ্ঘের মতো দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' বলে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি আরও বলেন, সঙ্ঘকে অকারণে বিতর্কে টেনে আনার ঘটনা নতুন নয়। এবারও সঙ্ঘকে 'বলির পাঁঠা' করার প্রয়াস চলছে।

সঙ্ঘকে বদনাম করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবার একই দিনে দেশজুড়ে ধর্নার কর্মসূচী পালিত হয়। সঙ্ঘপ্রধান মোহনজী নিজে লক্ষ্ণৌতে এজন্য রাস্তায় নামেন। কয়েকটি জেলাকে ব্যতিক্রম ধরলে সারা দেশের সব জেলার কেন্দ্রে তো বটেই, সব মিলিয়ে ৭০০টি স্থানে ধর্নার কার্যসূচী পালিত হয়। দিল্লীর যন্তর-মন্তরে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ ধর্নায় অংশগ্রহণ করে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একই দিনে সারা দেশ জুড়ে এই ধর্না ও প্রতিবাদ সভা— সঙ্ঘের সাংগঠনিক শক্তি যে কী বিপুল এটা তারই পরিচয় দেয়। একজন বরিষ্ঠ কার্যকর্তার কথায়— 'মারভেলাস অ্যাচিভমেন্ট।' শ্রীভাগবত আরও বলেন, সঙ্ঘ এবার সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজমীর বিস্ফোরণে সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কর্মকর্তা ইন্দ্রেশজীর নাম জড়ানোকে তিনি নির্ভেজাল মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। চার্জশিট ফাইল না করে, তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ইন্দ্রেশজীর নাম জড়ানো হচ্ছে। দীপাবলীর আগের রাতে দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা করেই কাঞ্চীর শংকরাচার্যকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছিল। তিনি বলেন, সঙ্ঘের সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে যারা হিংসায় বিশ্বাস করেন তারা সঙ্ঘে যোগ দিতেই পারেন না। সঙ্ঘ সর্বদা আইন মেনে চলে। এজন্যই সঙ্ঘকে যখনই নিষিদ্ধ করা হয়েছে সঙ্ঘ আদালতে জয়লাভ করেছে। শ্রীভাগবত বলেন, সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এরকম জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করা না হলে সঙ্ঘ যথোচিত জবাব দেবে।

এসময়ে দক্ষিণবঙ্গে সফরে এসেছিলেন সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচারক প্রমুখ শ্রীমদনদাসজী। ১০ নভেম্বর খড়্গপুরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত ধর্নায় তিনি বক্তব্য রাখেন। কয়েকশত স্বয়ংসেবক এবং

লক্ষ্ণৌ-এ ভাষণরত মোহন ভাগবত।

সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী হিন্দু জনতার উপস্থিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সঙ্ঘ দেশভক্ত, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলে সর্বত্র পরিচিত। ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনৈতিক স্বার্থেই সঙ্ঘকে বদনাম করার জন্য 'স্যাফ্রন টেরর' শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছে। সঙ্ঘকে বদনাম করার এটা একটা চাল। চীনা আক্রমণের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দিল্লীর ট্রাফিক কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিয়েছিল। ফলে ১৯৬৩ সালের গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে জওহরলাল নেহরুর আহ্বানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যোগদান করেছিল। অন্যান্যদের মধ্যে খড়্গপুরে বক্তব্য রাখেন পৌরমাতা বেলা অধিকারী, তুষার মুখার্জী, রবিকিংকর ঘোষ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। মহকুমা শাসকের কাছে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ তিলকরঞ্জন বেরা ও জেলা সঙ্ঘচালক ঠাকুরদাস অধিকারীর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কলকাতায় হাজরা মোড়ে এবং শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ের কাছে পথসভা ও ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়, জয়ন্ত পাল, চঞ্চল জানা, রতন সোনী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বৈজনাথ রায়, এরশাদ আলি প্রমুখ। একইদিনে হাওড়া শহরেও ধর্নায় বক্তব্য রাখেন তথাগত রায়, অতনু রায়, রামধনী পাণ্ডে, প্রভাস মণ্ডল, রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব, উমেশ রাই প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গের মালদা ও রায়গঞ্জে ধর্না-পথসভা জনসভার রূপ নেয়। মালদাতে বক্তা ছিলেন ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, নীহারেন্দু দত্ত প্রমুখ। রায়গঞ্জের ধর্নায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন তপন চক্রবর্তী, নকুল চন্দ্র ঝা, গৌতম বিশ্বাস, বিশ্বরূপ কুণ্ডু এবং সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে ধর্না এবং পথসভা হয়। শিলিগুড়িতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী সংগঠনের বদনাম করার অপচেষ্টার জন্য কংগ্রেস দলের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবী জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রনেতা সঞ্জয় মণ্ডল, জগদীশ আগরওয়াল, স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন মণ্ডল এবং দিলীপ চৌধুরী প্রমুখ। মেদিনীপুর শহরে কালেকটি মোড়ে ধর্নায় বক্তব্য রাখেন কনক পানিগ্রাহী, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী ও সুনীলপদ গোস্বামী। ভারতব্যাপী ধর্নার অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণবঙ্গে আঠারোটি স্থানে ধর্না ও পথসভা হয়। বহরমপুর এবং নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরেও ধর্না ও পথসভা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার এবং বারুইপুরেও স্বয়ংসেবকরা ধর্নায় বসেছিলেন।

ভারতের পদক জয় রুখতে চীনের ষড়যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৪ নভেম্বর চীনের গুয়াংজৌতে আরম্ভ হওয়া ১৬ তম এশিয়ান গেমস শুরু হওয়ার মুখেই উঠল বিতর্কের ঝড়। চীনের বিরুদ্ধে খেলার মাঠেও ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আরও জোরদারভাবে জনসমক্ষে

উন্মোচিত হলো। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ নভেম্বর। এশিয়ান গেমসে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য যাওয়া আটটি ভারতীয় ঘোড়ার মধ্যে পাঁচটিকেই তাদের দেশে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে চীন। সরকারিভাবে জানানো হয় ঘোড়াগুলি বাধ্যতামূলক রোগ-নির্ণয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রসঙ্গত, ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞরা আশা করেছিলেন যে এশিয়ান গেমসে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ দু'টি সোনা এবার জিততে পারবে ভারত। বলা বাহুল্য, নক-আউটেই ছিটকে গিয়ে ঘোড়দৌড়ে পদক-প্রাপ্তির আশা জলাঞ্জলি দিতে বসেছে। অন্যদিকে, ভারতীয় প্রতিযোগীরা ছিটকে যেতে এগিয়ে চীনের পদক-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো।

এশিয়ান গেমস

কিন্তু গুরুতরভাবে প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি অসুস্থ ছিল ভারতীয় ঘোড়াগুলো? এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংবাদমাধ্যমের হাতে এসেছে তাতে এর পিছনে চীনের চক্রান্ত থাকার সম্ভাবনা বহুলাংশে রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। কারণ যে রোগের জন্যে অর্থাৎ ভেনেজুয়েলান ইকুইন এনসেফালোমায়েলিটিস— এই রোগটি ইতিপূর্বে ভারতে তো দূরের কথা, (এরপর ৪ পাতায়)

আখের গুছিয়ে পোড়ামাটি নীতি বামফ্রন্টের

।। গুড়পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে সিপিএম দল ও তার পরিচালিত সরকারি প্রশাসন ততই বেসামাল হয়ে পড়ছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত সিপিএম নেতৃত্ব এবং তার স্তাবক পুলিশ ও প্রশাসনের আমলারা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। কী মহাকরণ কী লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরের বড় বড় আমলারা অজানা আতঙ্কে ভুগছেন। কেউ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। ফলে ভুগতে হচ্ছে কম বেশি সকলকেই। আমলারা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এমন সব উল্টোপাল্টা কথা বলছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন যা শুনে চোখ কপালে উঠে যায়।

হ্যাঁ, এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহার। বিজেপি নেতৃত্ব ৩০ নভেম্বর মহাকরণ (এরপর ৪ পাতায়)

কেন্দ্র সরকার কি 'কাশ্মীর বিতর্কিত' শর্ত মেনে নিচ্ছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় সরকার কি আবার কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক বিষয় করে তুলতে চাইছেন? কেননা, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের সূত্র অন্বেষণে কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত পর্যবেক্ষক দল সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ব্যাপারে পাকিস্তানকেও যুক্ত করতে হবে বলে আবার জানিয়েছেন। এর আগে দলের অন্যতম প্রতিনিধি দিলীপ পদগাঁওকরও এই মর্মে বক্তব্য রেখেছিলেন। তখন তা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেই বিতর্কের রেশ মিটতে না মিটতেই পর্যবেক্ষক দলের বলেছেন, পাকিস্তানের প্রাক্তন আমলে এনিয়ে যে কথাবার্তা করতে হবে। কাশ্মীরের ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— নীতির বিরুদ্ধেই তাদেরই নিযুক্ত বক্তব্য রাখায় ব্যাপক বিভ্রান্তির আগে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর চূড়ান্ত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন

দিলীপ পদগাঁওকার

গিলানী

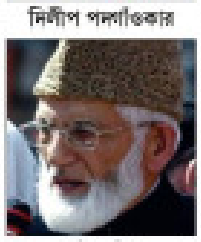

গত ১১ নভেম্বর জম্মুতে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বাধীন কামান দেগেছেন। ওমরের নিয়ে আলোচনা শুরুর জন্য দিল্লী আলি গিলানির প্রস্তাবিত পাঁচটি বক্তব্য, "কেন্দ্র সরকারের নিযুক্ত অন্যতম প্রতিনিধি রাধাকুমার প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের হয়েছিল, সেখান থেকেই তা শুরু ভারতভুক্তি চূড়ান্ত ও কাশ্মীর ভারত সরকারের ঘোষিত এই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এমন সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি তুলেছিলেন।

ওমর এবার কাশ্মীর প্রশ্নে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধেই অভিযোগ হলো—" কাশ্মীর ইতিমধ্যেই হুরিয়ত নেতা সৈয়দ শর্ত মেনে নিয়েছে।" তাঁর আরও তিন সদস্যের এই পর্যবেক্ষক দল ইতিমধ্যে কাশ্মীরকে বিতর্কিত বলে ঘোষণা করেছেন এবং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানেরও ভূমিকা আছে বলে তারা স্বীকারও করে নিয়েছেন। নতুন দিল্লী এইসব বক্তব্যের একটিকেও অস্বীকার করেনি। বাকি চারটি শর্ত রাজ্য সরকারের (এরপর ৪ পাতায়)

জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত

এখন স্বশাসনের কথা বলা রাষ্ট্রদ্রোহিতা : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও-এ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠকে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে জম্মু-কাশ্মীর সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হলো।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল কাশ্মীর উপত্যকায় হিংসাত্মক পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করছে। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার কাশ্মীর উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার মতো ভুল আবারও করে চলেছে। সব থেকে চিন্তাজনক হলো 'কাশ্মীর সমস্যা' বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের লেলাচল-মনোবৃত্তি। এখনকার মতো আগে কখনও কেন্দ্র সরকারকে এরকম শিশু-সুলভ পদক্ষেপ, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের দেশবিরোধী প্রচার অভিযান তথা কাশ্মীর সমস্যাকে অনাবশ্যকভাবে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে এতটা দুর্বল এবং প্রভাবহীন দেখা যায়নি। দেশদ্রোহমূলক রাষ্ট্রঘাতী ভাষণ দেওয়া চলছে বিনা বাধায় সরকারের নাকের ডগায়।

আর এস এস-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডল সকলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে, গিলগিট, বালটিস্তান, মুজফ্ফরাবাদ, মীরপুর এবং আকসাই-চীন সহ সম্পূর্ণ কাশ্মীরের চূড়ান্ত ভারতভুক্তি (ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত) অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। সেদিন অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে মহারাজা হরি সিং জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন আর তাতে সীলমোহর লাগিয়েছিলেন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন। পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নির্বাচন সুসম্পন্ন হওয়াতে তাতে জনাদেশের সীলমোহরের ছাপও পড়ে যায়। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী- শেখ আব্দুল্লা সমঝোতার ফলে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বিষয়ে সবরকম বিবাদ চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল একথা আবারও বলে দিতে চায় যে, জম্মু-কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিভাজ্য অঙ্গ। তথাকথিত 'আজাদী' (স্বাধীনতা) বা জনমত সংগ্রহের দাবী দেশদ্রোহিতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নয়। কাশ্মীরের 'আজাদী' পাকিস্তান সমর্থক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ইসলামি কট্টরপন্থীদের এক চাল মাত্র।

সঙ্ঘের কার্যকরী মণ্ডল জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে— যেখানে তিনি বলেছেন, 'জম্মু-কাশ্মীর কখনও পরিপূর্ণভাবে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি'। নিজের অপরিপক্কতা এবং দুর্বলতার ফলে তিনি রাজ্যকে হিংসার দাবানলের আগুনে নিক্ষেপ করেছেন। ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি হিংসাত্মক ঘটনাকে কঠোরভাবে দমন করার পরিবর্তে তা ছড়াতে সুযোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমেও নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ বাতাবরণ নির্মাণের কাজ করেছেন। আবার মাঝে মধ্যে গলা চড়িয়েছেন সেই ভাষায়— যে সকল কথা কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষকদের উস্কানিতে ব্যক্ত করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্র সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করার বদলে সমর্থন করছেন বলে দেখা যাচ্ছে। এরফলে দেশের অখণ্ডতার পরিবর্তে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির খেলাটাই ধরা পড়ছে। কার্যকরী মণ্ডল এসব কর্মকাণ্ড দেখে অবাক—বিস্মিত, স্তব্ধ।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছে, কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশভক্ত ভারতবাসীকে উপত্যকার মূল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। অপরপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরকেই উপত্যকার প্রতিনিধি হিসাবে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। ওই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন —দেশভক্ত মুসলমান, কাশ্মীরী পণ্ডিত, শিখ, শিয়া, পার্বত্য লাদাখের বৌদ্ধ সম্প্রদায়, রাজ্যের গুজ্জর এবং বাখরবাল সম্প্রদায়। এছাড়াও রয়েছেন কয়েক লক্ষ বিতাড়িত উদ্বাস্তু পণ্ডিত— যাদেরকে স্বাধীনতার ৬০ বছর বাদেও দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। এবং আছেন জম্মুর অধিবাসীরা। কার্যকরী মণ্ডল সরকারকে বলতে চায়, সরকার যেন জম্মু-কাশ্মীরের সেই সকল অধিবাসী এবং বিশেষত কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং পাক-দখলীকৃত কাশ্মীর থেকে আগত শরণার্থীদের সঙ্গেও কথা বলেন। ওই সকল কাশ্মীরবাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং উগ্রপন্থীদের শতসহস্র অত্যাচার সহ্য করার পরও ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ও অনুগত হয়েই থাকতে চান। কিন্তু ওই সকল ভারতবাসীদের দেখে একথাই মনে হয় যে, সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের-ই গুরুত্ব দিয়েছেন আর তাদেরকে উপেক্ষা করেছেন।

কার্যকরী মণ্ডল তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করছে, কেননা সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে— সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলগুলোর কাশ্মীর সফরের সময়ে যে সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের মান্যতা দেওয়ার দরকার ছিল না তাদেরকেই দারুণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর ভারত-সমর্থক দেশভক্ত নাগরিকদের কথা শোনার মতো সময় বা দৃষ্টিকোণ ওই প্রতিনিধিদের ছিল না।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, বিগত কুড়ি বছরে দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর বীরত্বব্যঞ্জক প্রয়াসের ফলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের পায়ের তলার মাটি আলগা হয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় ৫০০০ নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গতকে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। তারপর আজও নিরাপত্তারক্ষীরা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদেরকে সমর্থন করার পরিবর্তে দেশের সরকার, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদ মাধ্যমের একাংশ তাদেরকে 'খলনায়ক' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিত্তিহীন অভিযোগের নামে প্রতিরক্ষা-বাহিনীর মনোবল ভাঙার অপপ্রয়াসকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল তীব্র ভর্ৎসনা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমাদের ভুললে চলবে না, যে ধরনের সন্ত্রাসের সাহায্য এসময়ে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নিচ্ছে তা সন্ত্রাসবাদীদের পরিবর্তিত রণনীতির অঙ্গ এবং শুরু থেকেই রয়েছে। তা সে ১৯৪৭-৪৮-এর কবাইলী (জনজাতি) হামলা, ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯-এর প্রত্যক্ষ পাক-আক্রমণ অথবা নব্বাই -এর দশকের সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে ছদ্মযুদ্ধ (প্রক্সি ওয়ার), অথবা এখনকার

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

বদলি

বদলি জিনিসের বদল যে কি জিনিস সে সম্পর্কে আপনাকে সম্যক অবহিত করতে পারেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। মিনি ৬৮৭ দিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বে তাঁর আধিকারিকদের এখনও অবধি ৩৪২ বার বদলি করে একটি কীর্তি স্থাপন করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। অর্থাৎ গড়ে দু'দিনে একজন করে অফিসার বদলি! ভাবা যায়! আরও আশ্চর্যজনক হলো, স্রেফ গত ৩১ অক্টোবরেই ৬১ জন বরিষ্ঠ প্রশাসনিক আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দেন গেহলট। তবে বদলি-র উপরোক্ত পরিসংখ্যান আই এ এস, আই পি এস এবং ফরেস্ট সার্ভিসের মতো কর্মে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরিসংখ্যানে রাজ্য পুলিশ, শিক্ষক এবং চিকিৎসা কর্মীদের বদলির হিসেবটা ধরাই হয়নি। জনৈক নিন্দুকের ব্যাখ্যা, বছরভর পর রাজস্থানের গদিতে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন, সবাই মধুর লোভে ঝাঁপাতেই গোটা প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত। বলিহারি কি কূল পাওয়া যাবে?

কূটনীতি

সখী কূটনীতি কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়? ওবামাসাহেবের বর্তমান থিমসং। বেশ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে গলায় গলা, হাতে হাত মিলিয়ে। কিন্তু গোল বাধাল টীন। একটা সময় ছিল যখন পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদের সেয়ানে সেয়ানে টক্কর চলত। সেদিন গেছে। এখন আমেরিকা আর চীনে 'পুঁজির সাম্য'ই পরিলক্ষিত হয়। তবে দু'জনের রেশারেশিটা আগের মতোই আছে এবং একইভাবে। সমস্যাটা হলো, মার্কিন দেশে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস (যেমন ৯।১১) রুখতে কৌশলগত কারণেই পাকিস্তানকে দরকার আমেরিকার। কিন্তু 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' নীতি অনুসরণ করে ভারত-শত্রু চীনের সঙ্গে ইদানীং দারুণ দোস্তি হয়েছে পাকিস্তানের। এমতাবস্থায় কূটনীতি করা যে কি দায়, তা কেবল ওবামাসাহেবই বোঝেন!

তালিবানী কৌশল

বেড়াল যদি বলে মাছ খাবো না তবে কি আপনি তা বিশ্বাস করবেন? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মুখ খোলাও ঠিক তেমনি। তবে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানের এই অঙ্গীকার যে কতখানি ভুয়ো তার প্রমাণ পাক-প্রশাসন আরেকবার দিল।

সম্প্রতি, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের তালিবানরা ভারতসহ গোটা বিশ্বের বুকে সন্ত্রাসরাজ কায়েম করতে হাতে তুলে নিয়েছে এক নতুন অস্ত্র— কিডন্যাপিং। মোটা টাকার বিনিময়ে পাকিস্তানের নামীদামি ও ভি আই পি মানুষদের অপহরণের এক জঘন্য খেলা শুরু করেছে তালিবানি জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই তাদের এই নয়া কৌশল। এমনকি, প্রয়োজনে অপহৃতদেরও গ্রামে মারতে কসুর করে না সংগঠনটি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, পাক সরকারের অঙ্গুলিহেলন ব্যতীত অন্যেরা এই ধরনের কর্ম সম্পাদন করতে আদৌ সাহস পাবে না।

ঘুমিয়েই বিশ্বজয়

এবার 'ঘুমকাতুরে' কুম্ভকর্ণকেও পেছনে ফেলে দিল নিউজিল্যান্ডের শিশুরা। সম্প্রতি, বিশ্বের ১৬টি দেশের একদল চিকিৎসক ইন্টারনেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, দীর্ঘসময় ধরে ঘুমিয়ে গোটা বিশ্বের বুকে এক 'নয়া' নজির সৃষ্টি করেছে নিউজিল্যান্ডের শিশুরা। সারাদিনে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিট তারা ঘুমোয়। শিশুদের বয়স আনুমানিক ৩ বৎসরের মধ্যে। তবে এ ব্যাপারে পিছনে পড়ে রয়েছে জাপানের শিশুরা। প্রত্যহ ১১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ঘুমিয়ে বিশ্বের 'স্বল্প সময়ের ঘুমকাতুরে শিশুদের' তকমাও তাদের কপালে ইতিমধ্যেই জুটে গেছে। টোকিওকাইটা সোশ্যাল ইনসুরেন্স হাসপাতালের প্রধান জুন কোয়ামার পর্যবেক্ষণ "জাপানে শিশুরা রাত্রি ৯.১৮ মিনিট ঘুমোয় এবং সকাল ৭টা ৮ মিনিটে তাদের ঘুম ভাঙে।"

বিচিত্র প্রশ্নমালা

আপনি কি অপরকে প্রশ্ন করতে ভালবাসেন? আপনার মনেও কি জমে আছে অজস্র প্রশ্নের স্তূপ? তাহলে আপনার জন্য সুখবর! না না, জি-বাংলার দাদাগিরিতে যোগ দিতে বলছি না। বলছি, অপরকে প্রশ্নবাণে বেঁধে ফেলতে খুব শীঘ্রই আপনি হাতে পাবেন একটি অভিনব পুস্তক, যেখানে থাকবে শুধু প্রশ্নেরই অফুরন্ত ডালি। ১৬৪ পৃষ্ঠার এই অভিনব পুস্তকটির নাম 'দ্য ইন্টারোগেটিভ বুক'। প্রশ্নে ঠাসা পুস্তকটির প্রতিটি পাতায় চোখে পড়বে শুধু প্রশ্নেরই অফুরন্ত ভাণ্ডার। থাকবে না কোনও উত্তরমালা বা 'বাজার চলতি' গতানুগতিক সমাধান। 'দ্য ইন্টারোগেটিভ বুকে'র লেখক মার্কিন শিক্ষাবিদ্ প্যাডগেট পাওয়েলের কথায় 'প্রতিদিন ই-মেল মারফৎ পাঠকদের অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই আমি এই বইটি লিখতে বাধ্য হই।' বিশ্লেষকদের মতে বইটি একটি অবিস্মরণীয় স্বচ্ছ ও মজাদার রচনা। আপনি কি পালক পছন্দ করেন? আপনি কি ঘোড়ার বল্গারজ্জু ও সজ্জার সঙ্গে পরিচিত? এমনই অসংখ্য বিদঘুটে প্রশ্নের সন্ধান আপনি এই বইটির প্রতিটি পাতায় পাবেন।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বেড়াল

উত্তরপ্রদেশের পিলভিট জঙ্গলে এবার বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বেড়ালের সন্ধান পেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (ডব্লু ডব্লু এফ)। ডব্লু ডব্লু এফে'র পক্ষে হরিশ কুমার এই বিষয়ে জানান, "ওয়ার্ল্ডলাইফ ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া (ডব্লু আই আই), দ্য ন্যাশানাল টাইগার কনসারভেশান অথরিটি (এম টি সি এ) ও রাজ্য বন দপ্তরের সঙ্গে সম্প্রতি একটি ব্যাঘ্র সমীক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল ডব্লু ডব্লু এফ। সেইসময় আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই বিরল প্রজাতির বেড়ালটি।" টোসিংহা নামক একটি বিরল প্রজাতির কৃষ্ণসারমৃগের সন্ধানও তারা পায় পিলভিটে। এই কৃষ্ণসার হরিণটির মাথায় চারটি সিং (শৃঙ্গ) রয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস ও দুর্নীতি

কংগ্রেস ও দুর্নীতি যেন সমার্থক, একের পরিপূরক অপরটি। কংগ্রেস ও দুর্নীতি যেন দোঁহে দোহাকার, অর্থাৎ হরিহরাত্মা। দুর্নীতিকে বাদ দিয়া কংগ্রেসের অস্তিত্ব অর্থহীন। কংগ্রেসের পক্ষে এহেন বিশেষণ লাভ এমনি এমনি ঘটে নাই। ঘটিয়াছে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়ার শুরু কংগ্রেসের শুরু হইতেই। সচেতন ভারতবাসী মাত্রই জানেন কংগ্রেসের জন্মদাতা লর্ড হিউম একজন ইংরেজ, তিনি ইংরেজ সরকারের একজন দুঁদে আমলা ছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সুচিন্তিত পরামর্শেই তিনি সম্ভবতঃ ইংরেজের চাকুরি ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার নাটক করিয়াছিলেন। স্বভাবতই এদেশের সরল মানুষ ইংরেজের এই ধূর্ত নাটক ধরিতে পারে নাই। তাই নির্বিবাদে এদেশের তিনি রাজনৈতিক গুরু হইয়া ওঠেন। সুচতুরভাবে গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে, বৃটেন হইতে জিন্না এবং দেশের মধ্যে কিছু বৃটিশের চাটুকার বণিকদের আনিয়া হিউম সাহেব কংগ্রেসের জন্ম দিলেন। এদেশের স্বদেশী আন্দোলনের তৎকালীন সক্রিয় সংগঠক সুরেন ব্যানার্জী ও অন্যান্য কাহাকেও সেই কংগ্রেসের সম্মেলনে ডাকাই হইল না।

সেই শুরু কংগ্রেসের দুর্নীতি। দলাদলি হানাহানি, খেয়োখেয়ির সেই শুরু। এই খেয়োখেয়ির ফাঁক গলিয়া একজন বিদেশিনী আজও কংগ্রেসের প্রধান। আজকের দুর্নীতি সেদিনের সেই দুর্নীতিরই ধারাবাহিক রূপ। আজকের শাসক কংগ্রেস দল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ পর্যন্ত যত দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে তাহা সবই প্রায় কংগ্রেস দলের মধ্য হইতেই হইয়াছে। সে শেয়ার কেলেঙ্কারীই বলুন, কিংবা বোফর্স কেলেঙ্কারী। বিদেশিনী কংগ্রেস প্রধানের কৌশলই হইল ছাড়িয়া ধরা। অর্থাৎ কলঙ্কিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়া তাহাদের তাঁবে রাখা। যাহাতে তাহার অধীনে ক্রীতদাস হইয়া চিরকাল ভজনা করা যায়। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে তাহার মতো চতুর মহিলার সামনে এত দুর্নীতি কী করিয়া সম্ভব হয়? এই মহিলা আজ সি বি আই, আয়কর বিভাগ, আইন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ প্রভৃতিকে কংগ্রেসের এক একটি অস্ত্রে পরিণত করিয়াছে। যখন যাহাকে বধ কিংবা কলুষিত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন শুরুতেই এইসব বিভাগগুলিকে তাহার পিছনে লাগানো হয়। কমনওয়েলথ গেমস্ লইয়া যে লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীর্তি হইয়াছে তাহা যদি কংগ্রেস-প্রধানের অজান্তেই হইত তাহা হইলে বিজেপি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ঘোষণা করিবার সাথে সাথে বিজেপি-র এক নেতার বিরুদ্ধে আয়কর হানা হইত না।

কিন্তু কালমাদিকে রক্ষা করিতে গিয়া আজ যেন আর কূল রক্ষা হইতেছে না। কালমাদির দুই ঘনিষ্ঠও সিবিআই-এর জালে ধরা পড়িয়াছে, এই দুইজন—টি এস দরবারি এবং সঞ্জয় মহিন্দ্রু কমনওয়েলথ গেমসের প্রাক্তন কর্তা। আয়োজক কমিটির তৎকালীন যুগ্ম ডিরেক্টর জেনারেল দরবারি ও ডেপুটি ডিরেক্টর জেনালের মহিন্দ্রু ই-মেল জাল করিয়া লণ্ডনের গাড়ি ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম সরবরাহকারী সংস্থা এ এম কারস্ অ্যান্ড ভ্যানস্ এবং এ এম ফিল্মসের মালিক আশিস প্যাটেলের সংস্থাকে পরিবহন ও ভিডিও স্ক্রিন লাগানোর বরাত দেন। আই পি এলে কোচিকে নিয়ে বিতর্কের জেরে শশী থারুরকে আগেই বিদায় করা হইয়াছে। আদর্শ আবাসন, কমনওয়েলথ গেমস, টু জি স্পেকট্রাম— এই ধরনের একের পর এক দুর্নীতির দায়ে কংগ্রেসী মন্ত্রী ও ঘনিষ্ঠদের ছাঁটাই চলিয়াছে কাহার নির্দেশে? নেতৃত্ব ধরিয়া রাখার এ এক নতুন খেলা। বিরোধী দলগুলি কোন দুর্নীতিটিকে প্রধান করিয়া কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাইবে— তাহা লইয়াই তাহারা ধাঁধায় পড়িয়াছে কারণ প্রতিদিনই নতুন নতুন দুর্নীতি প্রকাশ হইয়া চলিয়াছে।

নেতা-নেতৃগণ নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখিতে তৎপর হোন তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু ইহার ফলে রাজকোষ যে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে তাহা কি মানা যায়? যেমন ধরুন সোয়ান টেলিকমকে ২০০৮ সালে মোবাইল পরিষেবায় অনুমতি দেওয়ার সময় ঠিক হইয়াছিল কোম্পানী দিতে চায় ১৩,৭৫২ কোটি টাকা। টেলিকম মন্ত্রী এই অফার প্রত্যাখ্যান করিয়া নয়টি কোম্পানীকে মাত্র ১,৬৫১ কোটি টাকায় বরাত দেন। ক্যাগ তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছে যে সোয়ান টেলিকমকে বরাত দেওয়া হইলে সরকারী কোষাগারে আসিত ৬৫,৭২৫ কোটি টাকা। কংগ্রেসী নেতৃত্বের ক্ষমতা অটুট রাখিবার এই খেলায় রাজকোষ এইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে।

যেকথা আগে বলিয়াছি বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপদে পড়িলেই বিরোধী দলের পিছনে সিবিআই আয়কর প্রভৃতি বিভাগকে লেলাইয়া দিয়া থাকে। এই বিষয়েও ঠিক তাহাই করিতে চলিতেছে। টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটাকে দিয়া অভিযোগ ওঠানো হইয়াছে যে পূর্বে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাকি বিমান পরিবহণের অনুমতির জন্য ১৫ কোটি টাকা ঘুষ চাহিয়াছিলেন। স্পষ্টতই ইঙ্গিত এন ডি এ আমলের এক মন্ত্রীর দিকে। বিজেপি-র মুখ বন্ধ করিবার এ এক নয়া কংগ্রেসীদের চালবাজি।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

এই আমার পবিত্রভূমি ভারতবর্ষ যে দেশের গৌরব গাথা গীত হয় দেবকণ্ঠ হতে— এ দেশে জন্ম নিয়েছে যারা মোক্ষ প্রাপ্তি এবং স্বর্গের দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত। এই সেই দেশ যা অজানা অতীত থেকে আমাদের কাছে প্রিয় দেশজননী ভারতমাতা, যার নামের মহিমায় আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হয় এক পবিত্র এবং স্বর্গীয় ভক্তির ফল্গুধারা।

—শ্রীগুরুজী

হিন্দু আতঙ্কবাদ

সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব

মাধবগোবিন্দ বৈদ্য

"হিন্দু আতঙ্কবাদ" এই শব্দ দুটি সংবাদ-মাধ্যমের নতুন সংযোজন। এর (শব্দ দুটির) উৎপত্তি কিভাবে কেউ জানে না। কেউ কেউ বলেন শারদ পাওয়ার এই শব্দ দুটির প্রথম প্রবক্তা। আবার কিছুলোকের বক্তব্য এর কৃতিত্ব কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী দিগ্বিজয় সিং-এর এটা নিশ্চিত যে এই ধরনের বক্তব্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে আহত করেছে —অপমানিত করেছে। অভিনব ভারত, সনাতন সংস্থা ছাড়াও ইদানীং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কিছু কার্যকর্তা হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত— এইরকম একটা অভিযোগ সরকার করেছে এবং এই সব সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে আনা এই সংক্রান্ত অভিযোগুলিও অস্বীকার করেছে। আরও উল্লেখযোগ্য, এইসব সংস্থার যে সব ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে এখন অবধি তাদের কোনও রকম শাস্তি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে আদালতে মামলা চলছে। সরকার তার আনা অভিযোগ এখনও প্রমাণ করতে পারেনি। মুসলমানদের 'জিহাদী আতঙ্কবাদ" বিষয়ে সকলেই ওয়াকিবহাল। শুধুমাত্র আমাদের দেশ ভারতবর্ষই নয়, এই আতঙ্কবাদ এখন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান হয়ে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর বিধ্বংসী পরিণাম সারা পৃথিবী দেখছে। এই আতঙ্কবাদের প্রভাবে আমাদের দেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। এর কারণ হলো —এই দেশ হিন্দু'র দেশ— হিন্দুস্থান, যদিও সরকারী ভাবে এই দেশের নাম ভারত বা ইন্ডিয়া। হিন্দুদের বাসভূমি হবার কারণেই এই দেশের উপর ইসলামিক আক্রমণ হচ্ছে। এটা আজকের নতুন বিষয় নয়— প্রায় হাজার বছর ধরে চলছে।

মুসলমান ভোটের জন্য

পৃথিবীতে মুসলিম বা ইসলামিক আতঙ্কবাদীদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। তাই সাধারণভাবে এই আতঙ্কবাদের সাথে ইসলামের সম্বন্ধ এবং ইসলামের শিক্ষাকেই দায়ী করা হচ্ছে। জিহাদ মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থের অন্তর্গত নিছক একটি শব্দমাত্রই নয়, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আমাদের স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতাদখল করা আর তার জন্য চাই মুসলমানদের ভোট। সুতরাং তাঁরা পরিকল্পিত ভাবে প্রচার করছেন— ধর্মের সাথে আতঙ্কবাদের কোনও সম্বন্ধ নেই, আতঙ্কবাদী শুধুই আতঙ্কবাদী, তার কোনও ধর্মীয় পরিচয় নেই, ধর্মের সাথে আতঙ্কবাদীর কোনও সম্পর্ক নেই ইত্যাদি। এই কথা যে ভুল তা কিন্তু নয়। আমি নিজেও বহুবার বলেছি এবং লিখেছি যে সব মুসলমান আতঙ্কবাদী নয়, কিন্তু সমস্ত আতঙ্কবাদী মুসলমান। যখন নকশালবাদ আজকের মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি তখন আমি এই কথা বলেছি এবং লিখেছি। তবে আজকের দিনে সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম ও আতঙ্কবাদ একাকার হয়ে গেছে। যাঁরা বলেন আতঙ্কবাদকে ধর্মের সাথে যুক্ত করা অনুচিত, তাঁরাই "হিন্দু আতঙ্কবাদ" বলে আতঙ্কবাদকে ধর্মের সাথে যুক্ত করতে চাইছেন। এর অর্থ একটাই— শুধুমাত্র ইসলামের সাথেই আতঙ্কবাদ সম্পর্কিত নয় অন্যান্য ধর্মের সাথেও এর সম্পর্ক আছে। একচেটিয়া ভাবে মুসলমান ভোট পেতে এটাই এখন রাজনৈতিক নেতাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কৌশল।

আজকের দিনে সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম ও আতঙ্ক বাদ একাকার হয়ে গেছে। যাঁরা বলেন আতঙ্ক বাদকে ধর্মের সাথে যুক্ত করা অনুচিত, তাঁরাই "হিন্দু আতঙ্ক বাদ" বলে আতঙ্ক বাদকে ধর্মের সাথে যুক্ত করতে চাইছেন। এর অর্থ একটাই— শুধুমাত্র ইসলামের সাথেই আতঙ্ক বাদ সম্পর্কিত নয় অন্যান্য ধর্মের সাথেও এর সম্পর্ক আছে। একচেটিয়া ভাবে মুসলমান ভোট পেতে এটাই এখন রাজনৈতিক নেতাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কৌশল।

এই অপকৌশল ব্যর্থ করতে হবে

মনে রাখা দরকার এইভাবে হিন্দু সমাজের বদনাম করা হচ্ছে, এটা হিন্দু ধর্মের পক্ষেও বিড়ম্বনার বিষয়। এই অপদস্থ করার প্রচেষ্টাকে আটকাতে এবং ক্ষমতালোলুপ স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের সক্রিয় হতে হবে। একথা বারংবার বলার দরকার নেই যে এই দেশের মূল সমাজ হিন্দু সমাজ। এই দেশের মুখ্য রাষ্ট্র প্রবাহ। এই দেশে জনচরিত্র, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মানবোধ, সমস্ত মত ও পথের প্রতি সমাদর, সমস্ত রকম মতাদর্শীদের জন্য সমান অধিকার যা কিছু আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অঙ্গীভূত এবং আমাদের সংবিধানে এইগুলি গৃহীত হয়েছে তার কারণ এই দেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং এই সমাজের (হিন্দু) মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া এবং একে অপদস্থ করার অর্থ দেশের মনোবল ভাঙ্গা এবং দেশকে অপদস্থ করা। এই অপচেষ্টা বন্ধ হওয়া দরকার। দয়ানন্দ সরস্বতী থেকে ডাঃ আম্বেদকর, ডাঃ হেডগেওয়ার প্রমুখ সমস্ত সমাজ সংস্কারক সমাজকে সঠিক পথে চালানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, আন্দোলন করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে ত্রুটি বিচ্যুতি কি শুধু হিন্দু সমাজেই আছে, মুসলমান সমাজে নেই? কিন্তু এর জন্য কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। কারণ তাঁরা জানতেন হিন্দুসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের উপরই দেশের ভালমন্দ নির্ভর করে। একারণেই "হিন্দুস্থান" এই দেশের পরিচয় ('হিন্দুদের দেশ')। এইজন্য এই সমাজের কিছু লোকের কুকীর্তির জন্য সম্পূর্ণ সমাজকে দোষী করা, এক ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহীতা। কোনও রাজনৈতিক দলই হিন্দু সমাজকে এই অপবাদের থেকে বাঁচাতে পারবে না। এরজন্য সমস্ত হিন্দু সমাজের উচিত রাষ্ট্র বা জাতীয় হিতচিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে দলীয় রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির প্রমুখদের এগিয়ে নিয়ে আসা —যেমন স্বামী বিশ্বেশতীর্থ থেকে গায়ত্রী পরিবারের ডাঃ পাণ্ডুয়া, কোয়েম্বাটুরের দয়ানন্দ সরস্বতী থেকে যোগাচার্য রামদেব বাবা সকলকেই একজোট হয়ে এবিষয়ে সরকারকে হুঁশিয়ারী দিতে হবে। এরজন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই প্রস্তাব অনুযায়ী দেশব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ করলেই কাজ হয়ে যাবে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য মূল রাষ্ট্রীয় সমাজকে অবমাননা করার মতো এই আত্মঘাতী প্রবণতা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। হিন্দু বিদ্বেষী ভোট প্রার্থী তখন এবিষয়ে সতর্ক হবে। কারণ সচেতন হিন্দু ভোটদাতাদের কেউই হিন্দুবিদ্বেষী ভোটপ্রার্থীকে ভোট দেবে না। হিন্দুবিদ্বেষী ভোট প্রার্থীকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে আপনি মুসলমান ও সেকুলারদের কাছে যান এবং ওদের ভোটে জিতুন। এই সমস্ত ভোটপ্রার্থীর প্রাণ মন সবই নির্বাচন ও গদীর দিকেই পড়ে থাকে। তাই যদি এই দিকে (গদী দখল) কোনও অসুবিধার সম্ভাবনা থাকে তাহলেই এরা ঠিক রাস্তায় হাঁটবে।

এই সব লোকেরা একসময় গেরুয়া, গেরুয়াকরণ ইত্যাদি শব্দ গালিগালাজ রূপে ব্যবহার করতো। কিছুদিনের মধ্যেই এদের টনক নড়ে গেরুয়া বা গৈরিক নিয়ে এই ধরনের কথা বলা লাভজনক নয়। তাই এখন এই শব্দগুলি প্রায় শোনাই যায় না। গৈরিক ত্যাগ ও পবিত্রতার প্রতীক। প্রত্যেক মন্দিরের শীর্ষে গেরুয়া রং-এর পতাকা থাকে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পরিধেয় গেরুয়া রংয়ের। তাই এই রংকে গালি দেওয়ার ফল ভাল হবে না। সুতরাং এইরকম গালিগালাজ বন্ধ হয়েছে। 'হিন্দু আতঙ্কবাদ' এই শব্দাবলীও এইভাবে বন্ধ হবে। কোনও কিছুকে উপলক্ষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ও পূজ্য ব্যক্তিত্বদের একজোট হতে হবে।

(এরপর ১৪ পাতায়)

জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি

(২ পাতার পর)

পাথর-ছোঁড়া সন্ত্রাসীস্বরূপ— সকলই প্রতিবেশী দেশের কাশ্মীর-উপত্যকা তথা ভারতব্যাপী সন্ত্রাসের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ মাত্র। বর্তমানে কাশ্মীর উপত্যকায় পাথর ছুঁড়ে ৩০০-এর বেশি নিরাপত্তারক্ষীকে ঘায়েল করা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি অনেক মারাত্মক। সন্ত্রাসের মুখে সুপরিকল্পিতভাবে নির্দোষ বালক-বালিকাদের সামনের সারিতে এগিয়ে দিয়ে তাদেরকে 'বলির পাঁঠা' করা হচ্ছে।

সশস্ত্র সৈন্যদের জন্য যে বিশেষাধিকার রয়েছে তাকে তুলে দেওয়ার যে দাবী ওঠানো হচ্ছে, তাকে দেশের পক্ষে ভয়াবহ পরিণামকারী বলে মনে করে অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল। জম্মু-কাশ্মীর এমন একটি সংবেদনশীল রাজ্য, যেখানে পূর্ব নিয়োজিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত চলে আসছে। যে কারণে সেখানে সশস্ত্র সৈন্যদের উপস্থিতি সতত এবং অনিবার্য বলেই পরিগণিত। এ কারণে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তা-বাহিনীর পর্যাপ্ত অধিকার থাকা উচিৎ এবং 'সশস্ত্র বাহিনী বিশেষাধিকার আইন' সেইরকম এক ব্যবস্থা মাত্র। অতএব তাকে প্রত্যাহার করা চলে না। একদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রসন্ন করতে সেনা-বাহিনীর বিশেষাধিকার তুলে দিতে একপায়ে খাড়া, অপরদিকে সেনাপ্রধান নিজেই এই অপচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতাকারী দলের সেইসব বক্তব্য এবং কার্যকলাপকেও কার্যকরী মণ্ডল কঠোর নিন্দা করছে যার দ্বারা মধ্যস্থতাকারীদের মনোভাব স্পষ্টই বোঝা যায়। মধ্যস্থতাকারীদের বেশ কিছু বক্তব্যে সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত কাশ্মীর বিষয়ক প্রস্তাব-১৯৯৪-এর পরিষ্কার বিরোধিতা বা উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই মধ্যস্থতাকারীদের না রয়েছে স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ, না আছে বিশেষজ্ঞতা এবং আইনগত মান্যতা। সংসদ স্বীকৃত বা জনাদেশও (জনগণের অনুমোদন) ওই মধ্যস্থতাকারীদের নেই। ওরা খোলাখুলিভাবে পাকিস্তান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে কাজ করছেন, যার ফলে জাতির (রাষ্ট্রের) সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। কাশ্মীরের মতো একটি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্র সরকার যাদের আগে থেকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ রয়েছে তাদেরকে মনোনীত করেছেন। এটা সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। কার্যকরী মণ্ডল ওই সকল দৃষ্টিকোণের কঠোর নিন্দা করে মধ্যস্থতাকারী দলকে ভেঙে দেওয়ার দাবী জানাচ্ছে।

কার্যকরী মণ্ডলের সুস্পষ্ট অভিমত হলো সরকার বিদেশীদের চাপে নত হয়ে কাশ্মীর উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে পরিবেশ তৈরি করছে। অনেক মন্ত্রীদের জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ওকালতি মাত্র। এরকম এক পরিস্থিতি তৈরির জন্য সর্বদলীয় প্রতিনিধি মণ্ডল, মধ্যস্থতাকারী দল কতিপয় রাজনৈতিক দলের কিছু ব্যক্তিবর্গকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল বার বার মনে করিয়ে দিতে চায় যে, কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানে সংবিধানের ইঙ্গিতবহ নির্দেশ এবং ১৯৯৪ সালে সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জম্মু-কাশ্মীরের পরিপূর্ণ ভারতভুক্তি অভিব্যক্ত ও স্বীকৃত হওয়া উচিৎ। স্বায়ত্বশাসন অথবা ১৯৫৩ সালের পূর্বেকার অবস্থায় ফেরানো কখনই নয়।

সঙ্ঘের কার্যকরী মণ্ডল সরকারকে সাবধান করে দিতে চায় যে, জম্মু-কাশ্মীরকে পুনরায় টুকরো করার প্রয়াস হলে দেশভক্ত নাগরিকদের সঙ্গে সকল ভারতবাসীই তীব্র প্রতিরোধ করবে। একই সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাচ্ছে— সকল মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা যেন সুনিশ্চিত করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষাই সর্বাগ্রগণ্য। তাকে উপেক্ষা করে কোনওরকম সমঝোতা যেন না করা হয়। একই সঙ্গে কার্যকরী মণ্ডল সকল ভারতবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, সকলে যেন জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং স্বায়ত্ত্বতার নামে দেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট করার যাবতীয় কুৎসিৎ অপপ্রয়াসকে বুঝে তাকে সফল হতে না দেন। 'স্বায়ত্ত্বতা' দেশেকে আরও একবার ভাগ করার পটভূমি সৃষ্টি করার অপর নাম, এটা দেশবাসী কখনও স্বীকার করবে না।

৯ লক্ষ্যভেদ

গত ১০ নভেম্বর সারা দেশের একটি খণ্ড চিত্র এটি। হিন্দু বিরোধী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ধর্নার অঙ্গ হিসেবে বীরভূম জেলার সিউড়িতে আর এস এসের প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হয়। ওইদিন সঙ্ঘের ধর্না-কর্মসূচীতে সারা দেশে সামিল হন ৯ লক্ষাধিক মানুষ। (পূর্ণাঙ্গ খবর ও ছবি ১ ও ১৬ পৃষ্ঠায়।

পোড়ামাটি নীতি বামফ্রন্টের

(১ পাতার পর)

অভিযান করবেন। উদ্দেশ্য, বামফ্রন্ট সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। নিয়ম নীতি মেনেই সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে মহাকরণ অভিযানে দলীয় মিছিল যাওয়ার আগাম অনুমতি বিজেপি নেতৃত্ব কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে নেয়। সম্প্রতি সিপিএম দল ঘোষণা করেছে যে ৩০ নভেম্বর দুপুরে কলকাতার এসপ্ল্যানেড এলাকায় দলের সমাবেশ হবে। তাই ওইদিন অন্য কোনও দলের মিছিল মিটিং করা যাবে না। আলিমুদ্দিন থেকে হুকুম আসতেই লালবাজারের পুলিশ কর্তাদের মাথায় হাত। দেড় দুই মাস আগেই তাঁরা বিজেপির ৩০ নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিলের আগাম অনুমতি দিয়েছেন। তড়িঘড়ি বিজেপির রাজ্য সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল জাভেদ সালিম। পরামর্শ দেন, ওইদিন বিক্ষোভ মিছিল করতে গেলে আলিমুদ্দিনের অনুমতি নিতে হবে। আলিমুদ্দিনের সিপিএম নেতারা যদি দয়া করে অনুমতি দেন তবেই বিজেপির মহাকরণ অভিযান করা যাবে, নতুবা নয়। অর্থাৎ এই রাজ্যে মহাকরণ লালবাজার থেকে ঘোষিত সরকারি সিদ্ধান্তই শেষ কথা নয়। শেষ কথা বলে আলিমুদ্দিন থেকে বিমান বসু এণ্ড কোং-রা। এমন একটি অগণতান্ত্রিক এক দলীয় সরকারকে বাংলার জনগণ ৩৫ বছর বরদাস্ত করেছে। ভবিষ্যতেও করবে কিনা সেটাই এবার বড় প্রশ্ন।

পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক পরিস্থিতির যেভাবে দ্রুত অবনতি হচ্ছে তাতে মনে হয় নির্বাচনের আগেই বামপন্থীরা পালানোর পথ খুঁজছে। খবরের কাগজের মাধ্যমে রাজ্যবাসী জেনে গেছেন যে ঋণের বোঝা এখন প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। সোজা সরল কথায় সরকার দেউলিয়া হয়েছে। সরকারি ভাঁড়ে মা ভবানী। এই সরকারকে বাঁচিয়ে রাখলে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যবাসীর কপালে হরি-মটর ছাড়া দ্বিতীয় কিছু জুটবে না। সকলেই জেনে গেছেন যে চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার যতগুলি উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে অর্থাভাবে তার সবগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে। উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা আর্থিক নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে কর্মীদের বেতন ও ভাতা দিতেই খরচ করা হচ্ছে। যেমন ডিসেম্বর মাস থেকে সরকারি কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত ৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার যে ঘোষণা করা হয়েছে সেই অর্থ আসবে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা কেটে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভ করে বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করার পর প্রশাসন চালাবে কীভাবে? একদা শূন্য ঘাটতি বাজেটের জনক অসীম দাশগুপ্ত মশাই শূন্য তহবিল রেখে গেলে অবশ্যই বিরোধী দল বিপদে পড়বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় স্তালিন এমনই পোড়ামাটি নীতি নিয়েছিলেন। একবিংশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে স্তালিনপন্থী সিপিএম নেতৃত্ব সেই পোড়ামাটি নীতিই নিয়েছে। নির্বাচনে আগে রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে আধা সরকারি কর্মীদের পেনশন ঘোষণা সবই সিপিএমের পোড়ামাটি নীতির কৌশল। তহবিল শূন্য এই সরকার বাস্তবে এর কিছুই করতে পারবে না। সেটা পারবে তা হলো পরবর্তী সরকারকে বিপাকে ফেলতে। ক্ষমতা হারাতে হবে জেনেই বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গকে চরম সঙ্কটে ঠেলে দিচ্ছে।

শর্ত মেনে নিচ্ছে?

(১ পাতার পর)

আওতায় পড়ে এবং সেই অনুসারে আমরা কাজও করছি।"

সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর এ ব্যাপারে নীরবতাই সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, সৈয়দ গিলানি এখন আবার আলোচনা শুরু করতে চাইছেন। যে গিলানি বলেছিলেন, 'কাশ্মীর বিতর্কিত'— এই শর্ত না মানলে কোনও আলোচনাই হবে না, সেই গিলানিই এখন আলোচনা শুরু করতে চাইছেন। এইসব প্রশ্ন তুলে ওমর আসলে নিজের আগের বক্তব্যকেই দৃঢ় করতে চাইছেন। ওমরের বক্তব্য, পাকিস্তানের ভূমিকা যদি নাই-ই থাকতো তবে স্বর্গীয় জওহরলাল নেহরু কেন তাঁর পিতামহ শেখ আবদুল্লাকে তৎকালীন পাক-জেনারেল আয়ুব খানের সঙ্গে আলোচন করতে পাঠিয়েছিলেন।"

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেওয়ার যতই চেষ্টা হোন না কেন, সোনিয়া গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস যে এখন তলে তলে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ভেট দিতে চাইছে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য, এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে ইতিমধ্যেই তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ 'কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত'— এই বক্তব্যকে সামনে রেখে দেশজুড়ে জনজাগরণের কাজ শুরু করেছে।

গো-হত্যা নিষিদ্ধ

(১ পাতার পর)

রায়। অন্যদিকে সরকারপক্ষের আইনজীবী ফজরুল হক। পরে জয়দীপবাবু জানান, "বল এখন রাজ্য প্রশাসনের কোর্টে। আদালতের আদেশ কার্যকর করার দায়িত্ব তাদের কাঁধেই বর্তায়। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বলব, সংখ্যালঘু কেন্দ্রিক রাজনীতিতে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে আদালতের এই নির্দেশকে পৌঁছে দিন"।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

চীনের ষড়যন্ত্র

(১ পাতার পর)

নিদেনপক্ষে এশিয়া মহাদেশেও কস্মিনকালে গোচরে আসেনি। আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের কিছু দেশে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এই রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, এই রোগটি ছোঁয়াচে এমন কোনও প্রমাণ এখনও অবধি মেলেনি। কূটনীতিকরা বলছেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় রোগটি ছোঁয়াচে কিন্তু এশিয়ান গেমসে তো এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোই অংশগ্রহণকারী, আমেরিকা কিংবা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর এতে যোগদানের সম্ভাবনা একেবারেই নেই, সুতরাং ডাক্তাররা চীনের ভূমিতে এই রোগটিকে 'আবিষ্কার' করলেন কিভাবে?

চীনের ভারত-বিদ্বেষ যেভাবে ক্রীড়াক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে তাতে আপামর বিশ্বের ক্রীড়ামহল উদ্বিগ্ন। অশ্বারোহী আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের পশুচিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডঃ গেম কুক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও উপভোক্তা পর্ষদের ডিরেক্টর ডাঃ আলফ-ইকবার্ট ফুসেল উভয়েই এশিয়ান গেমস আয়োজকদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন ভারতের পাঁচটি ঘোড়াকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গলদ রয়েছে। ঘোড়াদের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফুসেল চীনা কর্তৃপক্ষকে তাঁর ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভেনেজুয়েলান ইকুইনি এনসেফালোমায়েলিটিস রোগের ভাইরাসের খোঁজ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।' অপর একটি ই-মেলে তিনি বলেছেন, "এটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুবই বেদনাদায়ক যে চীনে অনুষ্ঠিত ১৬ তম এশিয়ান গেমসে যদিও অন্যান্য এশিয়ান গোমসগুলোর তুলনায় প্রচারটা ভালমাত্রাতেই হয়েছে কিন্তু ভারতের মতো একটি মহান এশীয় উপমহাদেশ-কে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হলো না;যার জন্য শুধুমাত্র ডাক্তারী পরীক্ষাকেই দায়ী করা চলে না।"

প্রসঙ্গত, গত ১১ অক্টোবর চীন কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ 'প্রোটোকল' ঘোষণা করেন। যাতে বলা হয়, ভারতীয় ঘোড়াগুলোর ১৮টি প্রকারের রোগ-পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। যার মধ্যে ৬টি রোগের অস্তিত্বই নেই এদেশে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই চীনা প্রোটোকলের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ভারত বিরোধী চক্রান্তের বীজ।

রাজা রাজনীতি

সূচপুরের রায়ে প্রকটিত হলো সিপিএমের কাপালিক চণ্ডমূর্তি

নিশাকর সোম

দশ বছর পরে সূচপুরের গণহত্যার রায় বেরিয়েছে। প্রকটিত হয়েছে সিপিএম-এর কাপালিক চণ্ডমূর্তি। নিজের দলের আধিপত্যর জন্য নরবলি। সেদিন সূচপুরে তৃণমূল দলনেত্রী গিয়ে শোকার্ত পরিবারদের সঙ্গে এই হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন।

তৃণমূল নেত্রী স্বভাবগতভাবে সর্বপ্রকার হত্যাকাণ্ডের পরেই সেখানে যান এবং স্বাভাবিক ভাবেই সিপিএম-কে উৎখাত করার কথা বলেন ও শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। এ সম্পর্কে সিপিএম-এর মুখ্য (মুর্খ) নেতাদের বক্তব্য ছিল 'মমতা নাটক করছে।' এ প্রসঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সাইরানীর বক্তব্য হলো— "সিপিএমও এই রকম নাটক করে দেখাক।" পঁয়ত্রিশ বছরের সিপিএম রাজত্বে ছয়বার গণহত্যা-লীলা সংগঠিত হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে "হাজার হাজার মানুষ-কে। আজকে অবশ্যই 'ম্যান-হান্টার' হিসাবে মাওবাদীরাও এসেছেন। পাল্টা-প্রতিরোধী কাণ্ডও ঘটছে। এটাই স্বাভাবিক। ফোর্স বি গেটস ফোর্স— হিংসা হিংসাকে আমদানি করে।

সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের বরাবর এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে— "বলং বলং বাহুবলং"— যো জিতা ওহি সিকন্দার। প্রথম যুগে সিপিএম স্লোগান দিত— 'জোর জুলুম-কে টক্করসে-একহি হামারা নারা হ্যায়।' পরে এটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়— "হামসে যো টকরায়েগা মিট্টি-মে মিল যায়েগা।' রাজনৈতিকভাবে জনগণকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়াতেই হত্যার অভিযান চালানোকে পথ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। প্রতিটি স্তরের নির্বাচনে জোর-জুলুম-হত্যা প্রভৃতি নারকীয় কাজ করা হয়েছে। এখন আবার ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য একই পন্থা নেওয়া হচ্ছে। এর ফল হবে মারাত্মক। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সিপিএমকে কি এরই পাল্টা ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে না?

সূচপুরের রায়ের পর একটি দৈনিকে কার্টুনিষ্ট কার্টুন-এ লিখেছেন— "এবার গোটা পার্টিটাই যাবজ্জীবন শাস্তি পাবে।"

সিপিএম নকশাল-মাওবাদের বিরুদ্ধে অনেক তীব্র সমালোচনা করে থাকে অথচ সিপিএম-নেতারা 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'— এই নীতিতেই বিশ্বাসী। এই নীতির ফলে শুধু যে ব্যাপক জনগণ সিপিএমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই নয়, ব্যাপকভাবে পার্টি সভ্য-কর্মী-সমর্থকগণও সরে যাচ্ছেন; নিষ্ক্রিয় হচ্ছেন। কারণ তাঁরা পড়ে পড়ে মার খেতে রাজি নন। তাঁরা দেখ্ছেন যে নেতারা বাড়ি-গাড়ি আত্মীয়স্বজন-এর বৈভব চাকরি-কনট্রাক্টরিতে সব গুছিয়ে নিয়েছেন, আর তাঁদের জন্য ভবিষ্যতে মার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আর বিমানবাবু খালি বলছেন— 'নিষ্ক্রিয় সদস্যরা দূর হোক।' পার্টি খালি হয়ে যাবে! তবে বিমানবাবুদের বিরুদ্ধেও বিদায়ের দাবি উঠতে শুরু করেছে।

সল্ট লেকের এক সভায় সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং আবাসন-মন্ত্রী গৌতম দেব বলেছেন— "এ-প্রজন্মের কাছে ৭০-৭২-এর সন্ত্রাসের কথা বলে লাভ নেই। কারণ তাঁরা সেটা প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁরা তাই বলছে তুমি রাজার পার্টি— তোমার পঁয়ত্রিশ বছরের রাজত্বে কি করলে?" গৌতমবাবু আরও বলেন, "নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা মুখস্থ করলে হবে না— তা-থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ হলো শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নামে পলিটব্যুরো তথা কয়েকজন নেতার হাতে ক্ষমতা চলে গেছিলো এবং নেতাদের সাইকো-ফ্যানরা যা বলতো নেতারা তাই বিশ্বাস করতেন। তাঁর ফলে জনগণ থেকে পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" তিনি বলেন, "কমিউনিস্টদের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ সরে যাচ্ছেন— এটা অস্বাভাবিক। পরিষ্কার ভোট হয়েছে এবং আমরা হেরে গেছি। ৩৫ বছর ধরে মানুষ দেখ্ছেন— জোনাল এবং জেলাস্তরের নেতাদের মাতববরি। তাদের তাড়িয়ে দোব। তুমি যদি মাতববরি কর তবে তুমিও চলে যাও। তোমাকেও তাড়াব। যে ভাবে পার্টি চলছে— তাতে একটা ক্লাব চলে না। পার্টিতে দু' একজনের কথার প্রাধান্য এবং ক্ষমতা দু'-একজনের হাতে সীমাবদ্ধ। যদিও গৌতমবাবুও ধোয়া তুলসী পাতা নন। তাঁর হাতে ন্যস্ত জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করে গ্রামের জল-কে আর্সেনিক মুক্ত করা। পঁয়ত্রিশ বছরে কি করেছেন গৌতমবাবু? আজও রাজ্যের সাতটি জেলা আর্সেনিক আক্রান্ত। ঘরে ঘরে ক্যানসার। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ভুগছে। ২০-২৫ বছর ধরে আবাসন দপ্তরে হাজার হাজার মানুষের ফ্ল্যাটের (ভাড়া) চাহিদা কম্পিউটারে আবদ্ধ করে ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিলেমিশে লক্ষ লক্ষ টাকার দামে আবাসন তৈরি হচ্ছে। আবাসন দপ্তরে প্রমোটারি দপ্তর পরিণত হয়েছে। গৌতমবাবুর দপ্তর-এর বহু "অনৈতিক" কাজ হয়েছে বলে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে।

গৌতমবাবুর সল্ট লেকের এই বক্তৃতার পটভূমি হলো উত্তর ২৪ পরগণায় পার্টি নেতাদের মধ্যে পচন এবং তাঁর দরুণ মাত্র দু'জন নেতা-কে বহিষ্কারের ঘটনা। এই দু'ই নেতারই নাকি বাস-ট্যাক্সি-মিনিবাস আছে? ৩৪টি রুটে নাকি রণজিৎ দাশের বাস আছে? এসব কে করেছিলেন? প্রয়াত মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর এ-ব্যাপারে কি ভূমিকা ছিল? জ্যোতি বসুর সমর্থন কোন দিকে ছিল? শুধু উত্তর ২৪ পরগণায় বা অন্য জেলায়— কিছু দুর্নীতিগ্রস্তকে তাড়ালেই চলবে না। লোম বাছতে গেলে গোটা কম্বলটাই ফেলে দিতে হবে। এবার মানুষ তাই করতে চলেছেন। পার্টির এক মন্ত্রী গায়ে বিলিতি মদ ঢেলে আত্মহত্যা করেন! একাধিক নেতার স্ত্রী তাঁদের নেতা-স্বামী সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। তারা দিব্যি সেই বহাল তবিয়তে আছেন। আর তুচ্ছ অছিলায় পীযুষ দাশগুপ্ত, অলোক মজুমদার প্রমুখদের বহিষ্কার করা হয়। মদ্য পান করা বর্তমান নেতাদের মধ্যেও নেই কি? রাজ্যের দু'জন নেতাকে কি এক "নার্সিং হোমের" মালিক ফ্ল্যাট দিয়েছেন? মদন ঘোষ এটা একটু খোঁজ করতে সাহস পাবেন কি?

সিপিএম আর কখনই উঠে দাঁড়াতে পারবে না— যতক্ষণ না বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-শ্যামল-বিনয় অ্যাণ্ড কোং-এর বিদায় হচ্ছে। কম্যুনিস্ট পার্টিতে দলাদলি জন্ম থেকেই আছে। নেতাদের নেতৃত্বের পথ করার জন্য জেলায় জেলায় গোষ্ঠীবাজিও জন্ম থেকেই আছে। বিরুদ্ধ বাদী নেতাকে "অর্থ ও মহিলা-ঘটিত" অপবাদ দিয়ে তাড়ানোর বহু ঘটনা আমাদের হাতে এসে গেছে। সমস্ত ঘটনার ময়না তদন্ত কি হবে? আসলে বর্তমান নেতারা হলেন 'রাজনৈতিক বামুন'। সব গেলো মরে, কত্তা হলো হরে।

সিপিএম নকশাল-মাওবাদের বিরুদ্ধে অনেক তীব্র সমালোচনা করে থাকে অথচ সিপিএম-নেতারা 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'— এই নীতিতেই বিশ্বাসী। এই নীতির ফলে শুধু যে ব্যাপক জনগণ সিপিএমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই নয়, ব্যাপকভাবে পার্টি সভ্য-কর্মী-সমর্থকগণও সরে যাচ্ছেন; নিষ্ক্রিয় হচ্ছেন। কারণ তাঁরা পড়ে পড়ে মার খেতে রাজি নন। তাঁরা তাই বলছে তুমি রাজার পার্টি— তোমার পঁয়ত্রিশ বছরের রাজত্বে কি করলে?" গৌতমবাবু আরও বলেন, "নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা মুখস্থ করলে হবে না— তা-থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ হলো শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নামে পলিটব্যুরো তথা কয়েকজন নেতার হাতে ক্ষমতা চলে গেছিলো এবং নেতাদের সাইকো-ফ্যানরা যা বলতো নেতারা তাই বিশ্বাস করতেন। তাঁর ফলে জনগণ থেকে পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" তিনি বলেন, "কমিউনিস্টদের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ সরে যাচ্ছেন— এটা অস্বাভাবিক। পরিষ্কার ভোট হয়েছে এবং আমরা হেরে গেছি। ৩৫ বছর ধরে মানুষ দেখ্ছেন— জোনাল এবং জেলাস্তরের নেতাদের মাতববরি। তাদের তাড়িয়ে দোব। তুমি যদি মাতববরি কর তবে তুমিও চলে যাও। তোমাকেও তাড়াব। যে ভাবে পার্টি চলছে— তাতে একটা ক্লাব চলে না। পার্টিতে দু' একজনের কথার প্রাধান্য এবং ক্ষমতা দু'-একজনের হাতে সীমাবদ্ধ। যদিও গৌতমবাবুও ধোয়া তুলসী পাতা নন। তাঁর হাতে ন্যস্ত জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করে গ্রামের জল-কে আর্সেনিক মুক্ত করা।

অন্য রকম

পোষা কাকের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাক যে কখনও কারুর পোষা হতে পারে দুর্গাপুরে প্রবেশের পূর্বে ভূ-ভারতে কারুর জানা ছিল বলে মনে হয় না। দুর্গাপুরের কয়লা-ব্যবসায়ী কণিষ্ক মুখোপাধ্যায়। শরীর কিংবা যে কোনও কারণেই হোক প্রাতঃভ্রমণে বেরনোটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। বিশ্বজুড়ে কয়লা-মাফিয়াদের যতই দৌরাত্ম্য থাক, কণিষ্কবাবুর অবস্থাটা আদার ব্যাপারীর মতো। জাহাজের কারবারের খবর রাখতে তাঁর বয়ে গেছে। ইতি-উতি কাকেরা ভোরের দুর্গাপুরে রাস্তার ময়লা সাফ করে দিচ্ছে— এমন দৃশ্যে বেশ অভ্যস্তই তিনি। এই সুযোগে কণিষ্কবাবুর পরিচয়টা একটু আগাগোড়া জেনে নেওয়া যাক। তাঁর পেশাগত পরিচয় পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর পারিবারিক পরিচয়— ভদ্রলোকের এখনও বিবাহ হয়নি। বয়স বত্রিশ বছর। বাবা কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এবং মা মঞ্জু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকেন দুর্গাপুর শহরেই লিঙ্ক পার্ক এলাকায়। বাবা-মা ছাড়া কণিষ্কের বাড়িতে ক'দিন আগে পর্যন্তও থাকত আটটি অতিথি। প্রজাতিতে যারা সারমেয়! এখন জুটেছে আরেকটি অতিথি। যার কথাই আজকের 'অন্যরকম'-এ উপজীব্য।

চকোলেট খাচ্ছে কয়া। (ইনসেটে) কণিষ্কবাবুর কাঁধে কয়া।

গত জুলাই-তেই একদিন প্রাতঃভ্রমণের সময়-ই কণিষ্কের চোখে পড়ল দৃশ্যটা। কয়েকটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে তাদের শিশুসুলভ চাপল্যে একটা কাকের পেছনে লেগেছে আর কাকটা না পারছে উড়তে, না পারছে দৌড়তে। কাকটি রক্তাক্ত অবস্থায় একপ্রকার নেতিয়েই ছিল। অতঃপর সেই কাকটি 'নতুন অতিথি' হিসেবে হাজির হলো কণিষ্কের বাড়িতে। মঞ্জুদেবীর পরম সেবা-যত্নে ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করল সে। তবে নাম রাখা হলো কয়া। কিন্তু উপস্থিত হলো নতুন এক বিপত্তি। আটটি সারমেয় অতিথি কোনও প্রকারেই নব অতিথি কয়াকে স্বাগত জানাতে রাজি হলো না। কিন্তু এখানেও কাজ করলো কণিষ্ক জননী মঞ্জুদেবীর কেরামতি। কল্যাণবাবুর স্বীকারোক্তি— "আমার স্ত্রী (মঞ্জুদেবী) সন্তানবৎ স্নেহে আটটি কুকুর এবং কাকটিকেও চান করান। তাঁর প্রচেষ্টাতেই কুকুরগুলো মেনে নিয়েছে কয়া-কে।"

কৃতিত্ব রয়েছে কণিষ্কবাবুরও। কয়া-কে প্রাতঃভ্রমণে অংশীদার করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে শুধু ভোরবেলা হাঁটতে বেরোনোই নয়, চা-বিস্কুট এমনকী চকোলেট পর্যন্ত খেতে শিখে গিয়েছে কয়া। পাড়ার চা-ব্যবসায়ী ৪৫ বছরের যুধিষ্ঠিরবাবুর বিস্ময়, "কাকটি আমার দোকন থেকেও এসে বিস্কুট নেয়। খুব মজা লাগে।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, কণিষ্কবাবু যখন জখম কাকটিকে দেখতে পান তখন তার সব পালক উঠে গিয়ে খুব বিশ্রী দেখাচ্ছিল। স্থানীয় পশুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন ট্যাবলেট ও মলম দেন এবং পথ্য হিসেবে গরম দুধ ও জল ড্রপারে করে কাকটিকে খাওয়াতে বলেন। ডাক্তারের নির্দেশ কণিষ্কবাবু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ঠিকই। কিন্তু কণিষ্কবাবুর নিজের সেবা-যত্নের কথাটা এখানে উল্লেখ না করলে 'অন্যরকম'-এর বর্ণনাটা নিষ্কলঙ্ক হবে না। দুধের সঙ্গে সেরেল্যাক গুলে খাওয়ানো থেকে কাকটির পুষ্টির জন্য তাকে চকোলেট খাওয়ানো— কি করেননি তিনি? আজ নতুন কালো পালক গজিয়ে কৃষ্ণকলি সাজে কাকটিকে দেখতে ভালই লাগে। আরও ভাল লাগে যখন দেখা যায়, কয়া বসে আছে কণিষ্কবাবুর কাঁধে। সত্যিই চওড়া স্কন্ধের একটা আলাদা মহিমা আছে বটে!

প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাবে কালীপুজোয় যোগদান কমছে ওপারের হিন্দুদের

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার মহদীপুর বাংলাদেশ সীমান্তে জিরো পয়েন্টের কাছে কালীপূজার পরের দিন প্রতিপদ তিথিতে দুই বাংলার হিন্দুদের উপস্থিতিতে হয়ে গেল শ্মশানকালী পূজা। দুই বাংলার এই মিলন মেলা ২০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন। এতদিন বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে হতো এই কালীপূজা। কিন্তু এবারই প্রথম কাঁটা তারের বেড়ার এপারে মন্দির তৈরি করে পূজা হলো। ফলে আগে বাংলাদেশের কানসার্ট, শিবগঞ্জ, চাপাই-নবাবগঞ্জ, বালিয়াদিঘি থেকে যেমন হাজার হাজার মানুষের ভীড় দেখা যেত এবার তেমনটি হলো না। বি এস এফের কড়াকড়িতে সকালের দিকে মাত্র ১ বারের জন্য গেট খুলে দেওয়া হলো এবং কিছু মানুষকে ঢুকিয়ে ফল নৈবেদ্য দিয়ে বের করে দেওয়া হলো। মহদীপুর সীমান্তে গিয়ে দেখা গেল কাঁটাতারের ওপারে অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে পূজা শেষে প্রসাদ নেওয়ার জন্য। গত বছরও ওপারে মন্দির থাকতে বাংলাদেশের হিন্দুরা সহজেই শ্মশানকালী পূজা দেখতে পেত, কিন্তু এবারে এপারের হিন্দুদের বেশী সংখ্যায় উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল।

স্থানীয় মানুষরা জানান, দুই বাংলা যখন এক ছিল তখন মহামারি ঠেকাতে বাংলাদেশ সীমান্তে এই পূজার প্রচলন হয়। এই শ্মশানকালীর পূজা চালু করেন নাথুরাম ঘোষ। বর্তমানে সমীর ঘোষ এই পূজার প্রধান উদ্যোক্তা। ওপারের শম্পা রজকের সাথে কথা হলো। বলল, গত বছর আমার মনস্কামনা পূরণ হওয়াতে পাঁঠাবলি দিয়েছিলাম। বছরে একবার এই পূজা উপলক্ষে বি এস এফ ও বি ডি আর উভয়ের সম্মতিতে দুই বাংলার মানুষরা তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে মিলিত হতে পারে। স্থানীয় পুরোহিত সন্টু বাগচী জানালেন। একদিনেই প্রতিমা তৈরি করে এই পূজা হয় তারপর পূজা শেষে বিসর্জন দেওয়া হয়। দুই বাংলার হিন্দুদের এই পূজাতে ওপারের হিন্দুরা যাতে বেশী করে আসার সুযোগ পায়, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন বাংলাদেশের মানুষরা। কিন্তু তার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ কে নেবে?

জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তি দিবস অনুষ্ঠিত মালদায়

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। গত ২৬ অক্টোবর মালদা শহর ও উত্তর মালদার চাঁচলে পালিত হলো জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তি দিবস অনুষ্ঠান। এদিন মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির পাদদেশে এবং চাঁচলে দুটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তি উদযাপন সমিতির মাধ্যমে দুটি পথ সভাতে ৩০০ জনেরও বেশী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মালদা শহরের পথ সভাতে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও জেহাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, বিজেপি-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোপীদা, সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ। চাঁচলে পথসভাতে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের পক্ষে সঙ্ঘচালক মোহিতলাল গোস্বামী, অনিরুদ্ধ সাহা, লক্ষণ পান্ডে, সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, অশেষকৃষ্ণ গোস্বামী, শীতল চক্রবর্তী প্রমুখ। দুটি পথ সভাতেই বক্তারা জম্মু ও কাশ্মীরে সম্প্রতি জেহাদের নামে মৌলবাদীরা সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালাচ্ছে তা উল্লেখ করেন। সন্ত্রাসবাদীরা মসজিদে লাগানো মাইক ব্যবহার করে জেহাদের নামে কীভাবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধবনি দিচ্ছে তা সকলকে জানান হয়। কাশ্মীর থেকে ৪ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পন্ডিতকে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তাড়িয়ে উদ্বাস্তু করেছে যারা, তারা আজ পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার মাধ্যমে হিংসাত্মক আন্দোলন চালিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিচ্ছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর এক নিশান, এক প্রধান ও এক বিধানের দাবিকে সামনে রেখে এই পথ সভা দুটি থেকে বক্তারা কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রাখার শপথ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান প্রায় হিন্দুশূন্য হতে চলেছে

রাধাকান্ত ঘোড়াই ।। অতি সম্প্রতি কাশ্মীরী মুসলমানদের জন্য একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের দরদ উথলে উঠছে। কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য সেমিনারে গলা ফাটাচ্ছেন অরুন্ধতী রায় থেকে সংসদ আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্ত ও পরে মুক্ত সৈয়দ আব্দুল রহমান গিলানী। সেমিনার হয়েছে দিল্লী থেকে কলকাতা। অথচ পাকিস্তানে হিন্দুরা যে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সেদিকে মানবতার মুখোশধারীদের কোনও উচ্চবাচ্যই নেই কেন? এনিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালে ২৩ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যার জন্য ২৬ শতাংশ ভূমি নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। তারপরও তারা ভারতের অনেক জমি যেমন গ্রাস করেছে (উদাঃ 'আজাদ কাশ্মীর' বা পি ও কে) তেমনই সে দেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করেছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে প্রতি পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে বসবাসরত হিন্দুদের মানবাধিকার। জমি-জায়গা, মান-সম্মান তো গেছেই, কেবল প্রাণটুকু বাঁচাতে ভারতে প্রতিনিয়ত পালিয়ে আসছে ওদেশের হিন্দুরা। সারা পৃথিবীতেই যেখানে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে তখন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা কমতে কমতে ভগ্নাংশের নীচে। অথচ ১৯৪৭ সালেই পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েট এসেম্বলিতে ভাষণ প্রসঙ্গে জিন্না আশ্বাস দিয়েছিলেন— পাকিস্তানে অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য থাকবে। বাস্তবে বিপরীত হয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৯৮-এ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার একটা প্রামাণ্য হিসেব পাওয়া গিয়েছে। তারপরও বার বার হিন্দুরা ভারতে চলে এসেছে— অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যা আরও অনেক কমেছে। একমাত্র সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি জেলা ছাড়া বেশীর ভাগ জেলাই হিন্দুশূন্য বলা চলে।

পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রধানত নিম্ন ও ইতর শ্রেণীর কার্যে নিয়োগ করা হয়। সাথে সাথে প্রায় সমস্ত হিন্দুদের একটি মুসলমানী ডাক নাম নিয়ে বাঁচতে হয়। এভাবে বেঁচে থাকার কী বিষম জ্বালা তা আগাম বুঝতে পেরেছিলেন সীমান্ত গান্ধী, তাই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন —অমুসলমানদের অবস্থা হবে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে থাকার মতো।

পাকিস্তানে এখনও ৪ শতাংশ অহিন্দু আছে বলে প্রচার করলেও বাস্তবচিত্র কিন্তু অন্য, যদিও সেই তথ্য সেভাবে আলোকিত হয়নি। ১৯৯৮ সালের পাকিস্তানের জনগণনার পরিষ্কার চিত্র দেখা যাক। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখানে চুপ কেন? সারণীতে পাকিস্তানে জেলাওয়ারি হিন্দুদের জনসংখ্যা কত শতাংশ রয়েছে তার হিসাব দেওয়া হলো। (সারণী দ্রষ্টব্য)

১৯৯৮ সালের জনগণনা অনুযায়ী পাকিস্তানে হিন্দুদের জনবিন্যাস

জেলা	প্রদেশ	হিন্দু (%)	বাদিন	”	১৯.৯৩১
পাকিস্তান	পাকিস্তান	১.৮৪৬	থাট্টা	”	২.৮৮৭
চিত্রল	উঃপঃ সীমান্ত প্রদেশ	০.০০১	সানঘর	”	২০.১৪৩
উচ্চ দির	”	০.০০৪	মীরপুরখাস	”	৩২.৭৩০
নিম্ন দির	”	০.০০৩	চেরকোট	”	৪৭.৫৭৩
সোয়েত	”	০.০১৩	থারপারকার	”	৪০.৪৬৮
শিয়ালকোট	পাঞ্জাব	০.১৩১	করাচি	”	০.৭৮৩
নারোয়াল	”	০.০৮৮	ইসলামাবাদ	এন সি টি	০.০২৪
লাহোর	”	০.০২৫	উত্তরএলাকা	উঃ এলাকা	হিন্দুশূন্য
কাসুর	”	০.০৮৯	আজাদ কাশ্মীর	আজাদ কাশ্মীর	হিন্দুশূন্য
ওকারা	”	০.০৩৬	কোয়েটা	বালুচিস্তান	০.৫৬১
শেখুপুরা	”	০.০৩৬	পিসিন	”	০.০১৩
বিহারী	”	০.০১৬	কুইলা আবদুল্লা	”	০.০৪৬
সাহিওয়াল	”	০.০১৪	ছাগাই	”	০.৯৫৮
পাক-পাট্টান	”	০.০০৬	লোরালাই	বালুচিস্তান	০.১৫৮
মূলতান	”	০.০৩৯	বারখান	”	০.১১৩
লোধরন	”	০.০০৪	কোয়েলা সইফুল্লা	”	০.০০২
খানেওয়াল	”	০.০১২	ঝোব	”	০.০৩৭
ডি জি খান	”	০.০২১	সিবি	”	১.৫৯৪
রাজানপুর	”	০.০৪৮	জিয়ারাট	”	হিন্দূশূন্য
লেয়াহ্ (ন্তম্ভন্তড়)	”	০.০৭২	কোহলু	”	০.১৭১
মুজফঃরাগড়	”	০.০৪২	ডেরাবুগটি	”	০.৭৭২
বাহাওয়ালপুর	”	০.৯২৯	জফঃফরাবাদ	”	১.৫০৮
বাহাওয়ালনগর	”	০.০৭৮	নাসিরাবাদ	”	০.৭৬৩
রহিম ইয়ারখান	”	২.৩৪০	বোলান	”	১.৫৪৬
জাকোবাবাদ	সিন্ধু	৩.৫৫৬	ঝাল মাগমি	”	১.০৯০
শিকারপুর	”	১.৮০১	কালাত	”	০.৬৯৭
লারকানা	”	১.৪১৮	মাসটাঙ	”	০.৬৮৩
সুক্কুর	”	৬.৬৭৮	খুজদার	”	০.৭১০
ঘোটকি	”	৬.৬৭৮	আওয়ারান	”	০.২৫০
খাইরপুর	”	২.৯৩৯	খারান	”	০.৩৭৭
নৌশেরো ফিরোজ	”	১.৩২৯	লাসবেলা	”	১.৪৪০
নওয়াবশাহ	”	২.৮৭৭	কেচ	”	০.২৩৭
দাদু	”	২.০৪২	গাওয়াদার	”	০.৩৮৯
হায়দরাবাদ	”	১২.০৭৬	পঞ্জগড়	”	০.১৯৫

উত্তর-কাশ্মীরে মুসলিম তুষ্টিকরণে উদ্যোগী কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার। এ বছরের জুন মাসে জম্মু-কাশ্মীরের হিংসায় বহু মানুষ নিহত হন। উত্তর-কাশ্মীরে প্রাণ হারান প্রায়

৫৪ জন। যাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। স্রেফ ভোট-ব্যাঙ্কের কথা ভেবে এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য শিক্ষাবিদ্ রাধাকুমার, তথ্য-কমিশনার এম এম আনসারি এবং দিলীপ পদগাঁওকারকে নিয়ে যৌথ দল গঠন করেছে কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, জম্মু-তে গত জুনে একইভাবে হিংসার বলি হয়েছিলেন অনেক মানুষ। তাদের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য সরকার প্রতিনিধিদল গড়া তো দূরের কথা, দুর্দশাগ্রস্তদের সামান্য সাহায্যটুকুও পৌঁছে দেবার সৌজন্য দেখাননি তাঁরা।

গত ৯ নভেম্বর লেহ্‌তে যান রাধাকুমার এবং আনসারি। বৈঠক করেন ওখানকার সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে। সেখানকার মুসলিম এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনজাতিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা। লাদাখের সিভিল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরাও এই আলাপচারিতাতে অংশগ্রহণ করে। দিলীপ পদগাওঁকার এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি, যেহেতু তিনি সেইসময় দেশের বাইরে ছিলেন।

কংগ্রেস, ন্যাশানাল কনফারেন্স এবং পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যদের সঙ্গেও পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠক করেন রাধাকুমার আর আনসারি।

গত আগস্ট মাসে মেঘ ভেঙে বৃষ্টির প্রকোপে আক্রান্ত হয়েছিল লেহ্-র বেশ কয়েকটি গ্রাম। ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল সেখানকার দৈনিক জনজীবন। কুমার আর আনসারির দল সেইসব গ্রামগুলিতেও যান। সাক্ষাৎ করেন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত জনজাতিদের সঙ্গে। এতদিন পর হঠাৎ সরকারের মনে এহেন সেবা-ভাব জেগে উঠল কেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। লাদাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের কাউন্সিলার ও অনেক প্রতিনিধিদের সাথে দলটি বৈঠক করেন। বৈঠকে উঠে আসে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন সমস্যা। প্রতিনিধিরা এ নিয়ে মতবিনিময় করেন। রাধাকুমারের কথায় "লেহ্ উপত্যকার অনেক প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা বৈঠক করি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল লাদাখের সংস্কৃতি ও ভাষা।" লাদাখের ভাষাকে সংবিধানে স্থান দেওয়ার দাবিও সেখানে অনেকে করেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

ব্যবসায়ী, উকিল, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা এবং সিভিল সোসাইটির বহু সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আনসারি ও রাধাকুমারের দল। তবে হুরিয়ত কনফারেন্স ও জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট আনসারিদের সঙ্গে দেখা না করায় সরকারের উদ্দেশ্য কতটা সফল হলো তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পাক সুরেই গাইছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ "যার খাচ্ছে, তারই দাড়ি ওপড়াচ্ছে"— এই প্রবাদবাক্যটিরই পুনরায় প্রতিফলন দেখা গেল জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার গলায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা গেল ক্ষমতায় টিকে থাকতে

পাক বিদেশমন্ত্রী কুরেশী।

ওমর আবদুল্লা

(পড়ুন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পি ডি পি প্রধান মেহবুবা মুফতি-কে টক্কর দিতে) জেহাদিদেরই হাত ধরতে চাইছেন ওমর। এবং এক্ষেত্রে তার দোসর বলা বাহুল্য কংগ্রেস।

গত ৯ নভেম্বর, জম্মুর একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, "ইদানীংকালে কাশ্মীর সমস্যার চাবিকাঠি রয়েছে একমাত্র পাকিস্তানের হাতে। তাই জম্মু-কাশ্মীরের মাটিতে পাকিস্তানের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।" এনিয়ে ভারতের প্রসঙ্গে ওইদিন একটি মারাত্মক কথাও বলেন ওমর, 'কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে মাত্র, ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

গত ৭ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চারদিনের ভারত সফর উপলক্ষে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ওমর আবদুল্লা ছাড়াও সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক, অভিনেতা ও বণিক-মহল উপস্থিত ছিলেন। তাতে ওবামার ভারত সফরকে অত্যন্ত সন্তোষজনক বলেও মন্তব্য করেন আবদুল্লা।

সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীরের মাটিতে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ আনে ভারত। ভারত সরকারীভাবে জানিয়েছে, পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সহ অস্ত্র রপ্তানির সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন জম্মু-কাশ্মীরের বিষয়ে পাকিস্তানকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তখন তাদেরই শরিক এনিয়ে সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে কি করে? বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীরে তাদের সরকারি জোটসঙ্গী যখন কেন্দ্রের প্রধান শাসক দল কংগ্রেস-ই! এই প্রসঙ্গে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী খোলাখুলি মুখ না খুললেও বলেন, 'আমরা জানি, জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তান কি খেলা খেলছে।"

পাকিস্তানকে 'খোসামোদ' করে জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যা ওমর কতটা মেটাতে পারবেন এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যথেষ্ঠ সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তিনি যে জম্মু-কাশ্মীরের লাগাম পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক এ ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। তাই তার এই মনোভাব যে দেশদ্রোহিতার ইঙ্গিত দিচ্ছে একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

কেমব্রিজে ভারতীয় অধ্যক্ষাকে হেনস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা আজ আর নতুন নয়। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের দৌলতে এ ধরনের খবর 'হামেশাই' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিবার পরিজন ও দেশের মায়া কাটিয়ে প্রতি বছর অসংখ্য ভারতীয় রওনা দেন সাত সমুদ্র পাড়ে বিদেশের উদ্দেশ্যে। কেউ যায় শিক্ষার

টানে। কেউ বা যায় পেশার তাগিদে। কিন্তু তার বিনিময়ে তাদেরকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে এক যন্ত্রণাদায়ক সত্যের।

এমনই একজন হলেন ডাঃ প্রিয়াংবদা গোপাল। পেশায় তিনি লন্ডনের চার্চিল কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষা। পেশার টানে বিদেশে পড়ে থাকলেও, এই ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি যে তাঁকেও কোনওদিন হতে হবে এটা বোধহয় তিনি নিজেও কখনও ভাবতে পারেননি।

সম্প্রতি, তাঁর কলেজের কিছু ছাত্র মদ্যপ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে অশালীন ও অভদ্র আচরণ করে। এমনকি, একজন ছাত্র তার পেছনে ধাওয়া পর্যন্ত করে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চার্চিল কলেজটির নাম আন্তর্জাতিক মহলে সুপরিচিত হলেও কলেজের ভিতরকার বাস্তব কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। তাই এ ধরনের ঘটনা যে এই কলেজে ব্যতিক্রম নয় এই কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। একটি সূত্র অনুযায়ী, ২০০৬ সাল পর্যন্ত কলেজটিতে প্রায় ১৯টি এই ধরনের ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে। এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত চার্চিল কলেজের ১০০ জন ছাত্রের নামও উঠে এসেছে। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে কলেজের গ্রন্থাগারে দু'জন ছাত্র-ছাত্রী অশ্লীল অবস্থায় ধরা পড়ে। গ্রন্থাগারিকের কাছে তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলা হয় এবং স্রেফ সতর্ক করেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে আইন বহির্ভূত "বুলডগ ড্রিংকিং সোসাইটি"র সদস্যবৃন্দ 'ইউনিভার্সিটি লেকরোস ক্লাবে'র নামে একটি নকল ক্রীড়া নৈশ ভোজের আয়োজন করে। এর ফলে ঘরের মধ্যে চলতে থাকে অশালীন অভব্য আচরণ ও আকণ্ঠ মদ্যপানের আসর। ঘর এবং ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটিকে তারা নষ্ট করে। ভরিয়ে তোলে আবর্জনায়।

এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি ছাত্রকে অপর এক ছাত্রের শারীরিক নিগ্রহের ফলে গুরুতরু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বোধহয় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ৮০০ বছরের পুরাতন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতে প্রায় ১৫ জন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছেন। প্রায় ১০০ টার মতো এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী খোদ্ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কেও হতে হয়েছে। কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে ডঃ প্রিয়াংবদার অভিযোগ "কলেজ চত্বরে প্রায়ই ছাত্রদের অশালীন ও মদ্যপ অবস্থায় দেখা যায়।"

সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রতিবছর বিদেশে পাড়ি দেয় প্রায় কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী। কিন্তু সেখানকার নামী দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এ হেন পরিবেশের দরুন হারিয়ে যাচ্ছে তাদের স্বপ্ন। অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের ভবিষ্যতের সিঁড়ি। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের প্রিয়জনদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই এই অন্ধকার থেকে হারিয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের আলোর জগতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব শুধু শিক্ষক, কলেজ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের নয়, এর জন্য দায়বদ্ধ সকলেই।

ভারত মহাসাগরে ‘মুক্তোর মালা’

মানস পাল

গত ৩১ আগস্ট সংসদে চীনের ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ও বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার বক্তব্য নতুন দিল্লী ও বেজিংয়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের বাতাবরণকে জনসমক্ষে নিয়ে এসেছিল।

বস্তুতঃ বেজিংয়ের ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক নীতিতে যে আগ্রাসনী বিষয়টি লুক্কায়িত এ নিয়ে নীতি নির্ধারক স্তরে আলোচনার সুযোগ থাকলেও সাধারণ্যে তেমন কোনও আগ্রহ অন্ততঃ এতদিন দেখা যায়নি। অথচ ভারতের সার্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্ট্রিং অব পার্লস বা মুক্তার মালা ঃ সরাসরি আক্রমণে না গিয়ে শান্তির আড়ালে শত্রুকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলা ও সময় সুযোগমতো আঘাত হানা চীনের একটি প্রাচীন সমর নীতি। ভারত মহাসাগরকে লক্ষ্য করে ভারতের সবকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চীনের অর্থনৈতিক, সামরিক ও পরিকাঠামোগত আধিপত্য বিস্তারের এই যে নীতি বেজিং বহুদিন ধরেই কোনও বিশেষ আলোড়ন না তুলে চালিয়ে যাচ্ছে তাকে ক্রিস্টোফার ফার্সন নামে এক আমেরিকান সমরবিদ প্রথম ‘স্ট্রিং অব পার্লস” বা ‘মুক্তার মালা নীতি’ বলে অভিহিত করেন।

ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক এই মুক্তার মালা নীতিতে বেজিং এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার-এ নিজেদের আধিপত্য ইতিমধ্যেই কায়েম করে নিয়েছে। বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানে বেজিং পরিকাঠামো ও সামরিক সমঝোতা নিয়ে আলোচনার স্তরে রয়েছে।

পাকিস্তানের চীনের উপস্থিতি সেই ১৯৬৩ সাল থেকে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী হিসাবে জুলফিকার আলি ভুট্টো প্রথম চীনের সঙ্গে ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে তা এত জোরদার হয় যে উত্তর কোরিয়া বাদ দিলে পাকিস্তানই চীনের সবচেয়ে বড় জোট সঙ্গী। বস্তুতঃ ইসলামাবাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক অভিভাবক এখন চীনই। এখানে চীন তার ‘স্ট্রিং অব্ পার্লস’ নীতির অঙ্গ হিসাবে গুয়াদর-এ এক বিশাল বন্দর তৈরি করেছে। এই গুয়াদর বন্দরে চীনা নৌবাহিনী যেমন তাদের জাহাজগুলি ভেড়াতে পারবে তেমনি এখানে তাদের জাহাজে জ্বালানী ভরাও সম্ভব হবে। তাছাড়া এই বন্দরে চীনারা তাদের গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্রও জমিয়ে রাখতে পারবে। মূলতঃ গুয়াদর পাকিস্তানে চীনাদের একটি ‘নেভাল বেস’। এখান থেকে চীন আবার সরাসরি আরব সাগর এবং এডেন উপসাগরে তেল ও পণ্যবাহী জাহাজ সহ নৌবাহিনীর জাহাজ চালাতে পারবে। গুয়াদরে চীনা নৌবাহিনীর উপস্থিতি ভারতের পশ্চিম প্রান্তের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীলঙ্কার একদম দক্ষিণ প্রান্তে চীন এক বিশাল বন্দর তৈরি করছে। ‘হামবান টোটা’-তে এই বন্দর তৈরি করতে চীনের এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করার প্রস্তাব রয়েছে। ২০২৩-এ তিনটি পর্যায়ে হামবান টোটা বন্দর শেষ হবে। প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে গেছে অবশ্য ইতিমধ্যেই। গুয়াদর বন্দরের সঙ্গে হামবান টোটার পার্থক্য হলো এটিকে চীন সামরিক ঘাঁটি বা

‘ভারত মহাসাগরে মুক্তোর মালা’।

হামবান টোটাকে ভবিষ্যতে চীনের সামরিক ঘাঁটি বানানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না (বালুচিস্তানে পাকিস্তান বিরোধী সমস্যা রয়েছে)। হামবান টোটা বন্দর ছাড়াও শ্রীলঙ্কায় বেজিং পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করছে, অর্থনৈতিক সহযোগিতাও রয়েছে। ভারত থেকে এদিক দিয়ে চীন শ্রীলঙ্কা উপকূলে অনেক বেশী এগিয়ে আছে।

মায়ানমারে চীন ‘কায়ুকপিও’ বন্দরকে পুনর্নির্মাণ করছে। এখান থেকে বেজিং সরাসরি বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরে যোগাযোগ করতে পারছে। এখান থেকে আবার চীন মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে জ্বালানী ও তেল আমদানীও করতে পারবে। কায়ুকপিও বন্দর থেকে বেজিং ১২০০ মাইল লম্বা তেল ও গ্যাসের পাইপ লাইন নেবে তাদের ইউনান প্রদেশের কুনমিং-এ। এই পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। এছাড়া কোকো আইল্যাণ্ডে চীনের পুরানো একটি বেস তো রয়েইছে। বাংলাদেশে চীন চট্টগ্রাম বন্দর পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। বেজিং ও ঢাকা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়া সোনাদিয়া দ্বীপেও একটি ‘ডিপ-সী পোর্ট’ তৈরি করার প্রস্তাবও চীনের বিবেচনাধীন। চট্টগ্রাম ও সোনাদিয়া প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বঙ্গোপসাগরে তথা ভারত মহাসাগরে চীন বাংলাদেশ থেকে সহজেই জাহাজ চালাতে পারবে। বাংলাদেশে এই দুটি বন্দর ছাড়াও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বেজিং আগ্রহী। শাহজালাল ফার্টিলাইজার ও পাগলা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এ চীনের সহযোগিতার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া চীন চাইছে কুনমিং-মায়ানমার-চট্টগ্রামকে একসঙ্গে যুক্ত করে এক বিশাল হাইওয়ে প্রকল্প চালু করতে। এটি চীনের দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক প্রকল্প। এই হাইওয়ে তৈরি হলে চীন সহজেই তার অস্ত্রশস্ত্র সহ সেনাসজ্জা কুনমিং থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবে।

কেন এই মুক্তার মালা ঃ ভারত মহাসাগরে চীনের উপস্থিতি সাম্প্রতিককালে বেজিংয়ের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে আমেরিকা, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান দেশগুলির সঙ্গে বেজিংয়ের টানাপোড়েন চলছে। চীন চায় দক্ষিণ চীন সাগরে তার একাধিপত্য। কিন্তু ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া সহ এতদঞ্চলের দেশগুলি তা মানতে নারাজ। আমেরিকাও দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে তাদের জাহাজ চালায়। ফলে ওয়াশিংটনও চায় না বেজিং এখানে একাকী রাজত্ব করুক। গত আগস্টে-ই ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় হিলারী ক্লিনটন স্পষ্ট ভাষায় আমেরিকার এ বিষয়ে অবস্থান পরিষ্কার করে দেন। ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকা একটি সামরিক ড্রিলও চালায়। ঠিক তেমনি সামরিক ড্রিল হয় দক্ষিণ কোরিয়া আর আমেরিকার মধ্যে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগস্টের শেষে আগে চীন ইয়েলো সী-তে একটি পাল্টা ড্রিল চালায়। উত্তর কোরিয়াও দক্ষিণ চীন সাগরে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে উদ্বিগ্ন। এর প্রভাব পড়ছে চীনের উপর। চীন থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে সামরিক সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

একদিকে যেমন দক্ষিণ চীন সাগরে চীন একাধিপত্য বিস্তারে বাধা পাচ্ছে তেমনি মালাক্কা প্রণালীতে রয়েছে ভারতীয় আধিপত্য। এমতাবস্থায় চীনের স্ট্রিং অব্ পার্লস নীতি দিয়ে ভারতকে যে শুধু ঘিরে ফেলার পেছনে সামরিক চিন্তাভাবনা কাজ করছে তাই নয়, চীনে এখন দক্ষিণ চীন সাগর ও মালাক্কা প্রণালীকে এড়িয়ে ভারত মহাসাগরে তাদের উপস্থিতি অর্থনৈতিক কারণেও জরুরী হয়ে পড়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকেই চীনের জ্বালানীর মূল অংশটা আসে। আর তা ভারত মহাসাগর দিয়েই আনতে হবে।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

বর্তমানে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আকসাই চীন

সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে ভারতকে

শ্যামাপ্রসাদ দাস

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চরিত্র কখনও বদলায় না। তারা যে কোনও বিষয়কে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলে নূতন নূতন এলাকা দখলের জন্য। যেমন ইসলাম ধর্মকে হাতিয়ার করে ছড়িয়ে পড়েছিল মুঘল সাম্রাজ্য। খৃস্ট ধর্ম এবং বাণিজ্যকে হাতিয়ার করে সম্প্রসারিত হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্য। তারপর এল রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ। তারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী স্বপ্ন ছড়িয়ে চাইল সারা পৃথিবী দখল করতে। সেই সূত্র ধরে কয়েকটি রাষ্ট্র দখল করে রাশিয়া রূপান্তরিত হলো সোভিয়েত রাশিয়ায়। এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাম আকসাই চীন। ভারতের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্বন্ধে দু’চার কথা বলতে গেলে অনেক কথাই চলে আসে।

বর্তমান চীন যে জন্মলগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী, তার একটি প্রমাণ হলো, ১৯৪০-এর দশকে নর্দান এরিয়া সন্নিহিত উইঘুর মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কিস্তান বন্ধু সেজে দখল করেন তৎকালীন চীনের চেয়ারম্যান মাও জে দং। তারপর তুর্কিস্তান নামটি মুছে ফেলে নাম রাখা হয় ঝিনজিয়াং প্রদেশ। এই হলো মহান কমিউনিস্ট দেশের একটি সাম্যবাদের নমুনা! এই সাম্যবাদ ছড়িয়ে দিতে চীন এখনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় কিছু এজেন্ট তৈরি করে! সেই সব এজেন্টদের প্রধান কাজ হলো মাওবাদের প্রচার এবং চীনা স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে জনগোষ্ঠী তৈরি করা। তারপর তারা চীনের অস্ত্র এবং অর্থবলে বলিয়ান হয়ে সেই দেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শুরু হয় সংঘর্ষ। এদের সঙ্গে পরোক্ষে সহযোগিতা করে চীনের সেনাবাহিনী। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখন এটাই এক বড় সমস্যা। এর প্রধান কারণ হলো, উত্তর-পূর্ব ভারতের খনিজ সম্পদ। চীনা বাজপাখীর নজর দীর্ঘকাল থেকেই অসমের খনিজ তেলের দিকে। তিববত দখলের পরে তাদের পরোক্ষ সাফল্য নেপাল। ভূটানের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো-টিও চলে গেছে তাদের হাতে। এখন অরুণাচল প্রদেশ চীনা মানচিত্রে চীনের এলাকারূপে চিহ্নিত।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নেহরু জমানায় পঞ্চ শীলচুক্তি, হিন্দি-চীনী ভাইভাই মৈত্রী বন্ধন সারা ভারতে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মার্কসবাদ- লেনিনবাদ-মাওবাদের জোয়ারে ডুবে গিয়েছিল বহু মানুষের মন। ‘চীনের চেয়ারম্যান— আমাদের চেয়ারম্যান’ বলেও হুঙ্কার দিয়েছিল বহু হঠকারী মানুষ। কিন্তু চীন এর কোনও মর্যাদা দিতে পারেনি। ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে চীন। দখল করে নেয় বেশ কিছু এলাকা। তারপর দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের একটি শত্রুরাষ্ট্র রূপেই অবস্থান করে চীন।

একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন এলো ভারতে। নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এলো বিজেপি। অটলবিহারী বাজপেয়ী হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি শত্রুর মানসিকতা বন্ধুত্বের বন্ধনে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। হলো চীন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি। শুরু হলো দুই দেশের বাণিজ্যিক মালপত্র আদান-প্রদান, কিন্তু ফল হলো বিপরীত। চীন তার স্বভাব পাল্টালো না। সীমান্ত রেখার ওপার থেকে বৈধ এবং অবৈধ ভাবে উচ্চমানের আবরণ দিয়ে সস্তায় নিম্নমানের মালপত্র এনে ভরে দিতে লাগলো ভারতের বাজার। এমনকী তার

এমন সব মালপত্র সরবরাহ করে যার কোথাও ‘মেইড ইন চায়না’ কথাটিও লেখা থাকে না। যার ফলে ভারতীয় মালের সঙ্গে মিশিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীগণ মোটা মুনাফা লুটছে। অন্যদিকে ভারতীয় মালপত্র চীন দেশের লোক সরকারের গোপন ইশারায় বর্জন করেই চলেছে। এ ভাবেই ভারতের শিল্প ধ্বংস করার কূটকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে চীন।

শুধু বাণিজ্যই নয়, সুযোগ সন্ধানী চীন সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের আবরণে জড়িয়ে প্রয়োগ করে আরও নানারকম কূটকৌশল।

১৯৪৭ সালে ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীরের একটা অংশ দখল করে নেয় পাকিস্তান। এর পেছনে যে চীনের ইশারা ছিল, তা এখন বেশ পরিস্কার হয়ে গেছে।

পাকিস্তান তার দখলদারি মজবুত করতে ১৩,২৯৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আজাদ কাশ্মীর বলে ঘোষণা করে। তারপর গিলগিট, বালটিস্তান, লাদাখ, ওয়াজারাত, হুনজা, নাগার ও সাক্সগাঁম এলাকার প্রায় ৭৮০০০ বর্গ কিলোমিটার নিয়ে গঠন করে ফেডেরাল অ্যাডমিনিস্টারড নর্দার্ন এরিয়া। ১৯৬৩ সনে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে সাক্সগাম উপত্যকার ৫৮০০ বর্গ কি.মি. এলাকা চীন পাকিস্তানকে উন্নয়নের নামে বোকা বানিয়ে নিজের হাতে তুলে নেয়। এভাবে পাকিস্তানকে বিভ্রান্ত করে ফেডার‍্যালি অ্যাডমিনিস্টার্ড ও নর্দার্ন এরিয়ার আর্থিক পরিকাঠামোটিকেও দখল করে। আর পাকিস্তান তার অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়ে চীনের বাহবা কুড়োতে থাকে। এর ফলেই নর্দার্ন এরিয়ার নাম বদল করে রাখা হয় গিলগিট বালটিস্তান প্রদেশ। সেখানে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চীনাসৈন্য। এ হলো চীনা বন্ধুত্বের আর এক নিদর্শন।

অতি প্রাচীনকাল হতেই তিববত ভারতীয়দের একটি ধর্মক্ষেত্র। এই পুণ্য ভূমিতে ভারতীয়গণ পদব্রজে কৈলাশ মানস সরোবর এবং অন্যান্য দেব-মন্দির দর্শন করতে যেতেন। দেবী দুর্গা ও শিব-ঠাকুর কৈলাশে অবস্থান করেন। বৌদ্ধ সমাজেরও তিববত একটি পুণ্যভূমি, কিন্তু কি সাংঘাতিক সহনশীলতা। চীনা নাস্তিকবাদী সরকারের তিববত দখলের বিরুদ্ধে ভারত কোনওরকম সামরিক হস্তক্ষেপে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বৌদ্ধ ধর্মে প্রভাবিত দেশগুলোও অহিংসাবাণী মাথায় রেখে চুপচাপ-ই ছিল! এখন ভারতীয় পুণ্যার্থীদের জন্য তিববতে পদব্রজে যাতায়াতের পথ বন্ধ। এর পরেও এক শ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিকদের (পড়ুন কমিউনিস্টদের) নির্লজ্জ চীনাপ্রেম ক্রমবর্ধমান।

যাই হোক, মনে হচ্ছে, চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য হঠাৎ ভারত সরকারের ঘুম ভেঙেছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানার জন্য চীনের প্রস্তুতি এখন প্রায় সমাপ্ত। ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের চাপে পরে ভারত সরকারও চীনের আগ্রাসন ঠেকাতে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে একদিকে আছে যেমন পূর্বাঞ্চলের সমস্ত সামরিক বিমানঘাঁটি এবং সড়ক উন্নয়নে সরকারের দ্রুত কার্যকরি ভূমিকা পালন করা। অন্যদিকে আছে উত্তরাখণ্ড, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরে ৬১টি নূতন সড়ক নির্মাণ। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশ, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন সরকারকে জানিয়েছে ২০১৭ সনের মধ্যে এইসব রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হবে। খরচ হবে পাঁচ হাজার কোটি টাকার উপরে। চীন সীমান্তে মোট ৭৩টি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে ৬১ টি রাস্তার কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। বাকি রাস্তাগুলো ২০২০ সনের মধ্যেই শেষ হবে বলে বি আর ও (বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন) কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করছেন। যা দিয়ে চীন ভারত সীমান্তের দুর্গম আউটপোস্ট হাইওয়ের মাধ্যমে যুক্ত হবে। এসব রাস্তার মধ্যে ১০টি রাস্তা নির্মাণের কাজ

(এরপর ৯ পাতায়)

প্রেক্ষিতে পাকিস্তান, তুলনায় ইজরায়েল
ধূর্ত শত্রু নীতিবাগীশ ভারতবর্ষ

কিরণশঙ্কর মৈত্র

বর্তমান প্রতিবেদনে ইজরায়েল-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তাই অনেকের জানা থাকলেও, আলোচনার সুবিধার জন্যে ইজরায়েল সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করি।

ইজরায়েল স্বাধীনতা লাভ করে ভারতের প্রায় এক বছর পর, ১৯৪৮ সালের ১৪ মে। এখানেও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। মিডল ইস্ট-এর (পশ্চিম এশিয়া) একটি রিপাবলিক ইজরায়েল, তিনদিকে আরব রাজ্য-বেষ্টিত। প্রাচীন প্যালেস্টাইনের ক্ষুদ্র অংশ রাজ্যটি অধিকার করে আছে।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর ইউনাইটেড নেশনস প্যালেস্টাইনকে ভাগ করে দেয় ইহুদি এবং আরবদের মধ্যে। একটি নতুন ইহুদি রাজ্য, প্যালেস্টাইনের ইহুদি-অধ্যুষিত অঞ্চল অভিহিত হলো ইজরায়েল নামে (১৫ মে, ১৯৪৮)। ইজরায়েলের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ অধিবাসী আরব।

প্রতিবেশী আরব রাজ্যগুলি ইজরায়েলকে আক্রমণ করে। ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতির পরে ইজরায়েল তার রাজ্যের সীমা এক-তৃতীয়াংশ বর্ধিত করে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ ক্রাইসিস-এ ইজিপ্টের সঙ্গে আবার সংঘর্ষ, ১৯৬৭ সালের 'সিক্স-ডে-ওয়্যার'-এর পরে ইজরায়েল জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরবর্তী গাজা স্ট্রিপ এবং সিনাই উপদ্বীপ অধিকার করে। ১৯৭৮ সালে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে দুই দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ইজরায়েল সিনাই থেকে চলে যায়।

কিন্তু ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন-এর মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়নি। দু'দেশের মধ্যে সংঘাত চলছেই। বিশেষ করে আরব দুনিয়ার হামাস-উগ্রপন্থীরা ইজরায়েলে নাগরিক ও সেনাদের উপরে অমানবিক খুন-জখম-অপহরণ চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত হামাস মিলিটারি কম্যান্ডার সাহমৌদ-আল-সাবহৌহ্। ইজরায়েলের তালিকায় সে ছিল 'মোস্ট ওয়ান্টেড' এক নম্বর উগ্রবাদী।

গত জানুয়ারি (২০১০) মাসে ইজরায়েলের সিক্রেট সার্ভিস মোসাদ ছত্তথত্রত্রট্টড্ডগ্ন-এর এগারো জনের একটি দল দুবাইতে গিয়ে সাহমৌদকে নিহত করে। ৯/১১-এর পরে পশ্চিমী জগৎ অনেকটা ভাবতে শুরু করেছে যে টেররিস্টদের গ্রেপ্তার করে আদালতের বিচার পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া বেশ কঠিন এবং ইজরায়েলের কাছে কুখ্যাত হত্যাকারী উগ্রপন্থী পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই আত্মগোপন করুক না কেন, তাকে খুঁজে নিশ্চিহ্ন করবে।

এ-সব কিছু থেকেই ভারতের অনেক কিছু শেখবার আছে। দিল্লির একজন অভিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ সাংবাদিক-প্রতিবেদক টেররিস্টদের নিশ্চিহ্ন করেছিল।

এবং চতুর্থত, গোপনে কর্ম-সম্পাদন। শত্রু শিবিরে প্রবেশ করে, প্রত্যাঘাত আসবার আগেই শত্রুকে শেষ করে দাও। বৈরী দেশে প্রবেশ করে সেখানকার

উত্তপ্ত গাজা ভূখণ্ড ইজরায়েল তবু পেরেছে, কাশ্মীরে আমরা পারিনি।

উগ্রবাদীদের সঙ্গে সংঘাতের চারটি পন্থা নির্ধারণ করেছেন— যা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, সন্ত্রাসবাদীরা দেশের যে-সব জায়গায় বা প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে বিস্ফোরণ-ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে— সেই সব লক্ষ্যস্থলগুলিতে পরিপূর্ণ প্রহরার ব্যবস্থা। কিন্তু এটা প্রায় অসম্ভব, সন্ত্রাসীরা কোনও না কোনও ফাঁক ফোঁকর খুঁজে বের করবেই। দ্বিতীয়ত, সরকারী ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে আতঙ্কবাদীদের প্ল্যান বানচাল করে দেওয়া। এটাও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নাও-হতে পারে। তৃতীয়ত, উগ্রবাদী হানার পরে সর্ব প্রচেষ্টায় অপরাধীদের সন্ধান করে গ্রেপ্তার করা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণ থেকে সতর্ক হয়ে তা নিবারণ করা যায়। ১৯৭২ সালে মিউনিখ আক্রমণের পরে ইজরায়েল পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধান করে প্রতিটি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের সাহায্যে প্রয়োজনে অর্থ অস্ত্র সাহায্য দিয়ে গৃহবৈরিতা সৃষ্টি করা।

পাকিস্তান চতুর্থ পন্থা অবলম্বন করে ভারতের সর্বাধিক সর্বনাশ সাধন করছে। সর্বশেষ নিদর্শন মুম্বাইয়ের ২৬/১১-এর গণহত্যা, অগ্নিকাণ্ড, বর্বরোচিত ধ্বংসলীলা। ওয়াকিবহাল মহল বলেন— কাশ্মীরের যে সব নেতারাই ইসলামাবাদের সুরে সুর মেলাননি বা বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, গুপ্তহত্যা দ্বারা পাকিস্তান তাদের সরিয়ে দিয়েছে।

ভারতের সাধারণ মানুষও একথা জানেন যে পাকিস্তান মুখে ভারতের সঙ্গে শান্তির বার্তা চালিয়ে যাবে— প্রলম্বিত করবে এবং অন্তরালে সক্রিয় থাকবে 'প্রক্সি ওয়ারে'। কারণ ভারতের সঙ্গে সোজাসুজি যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়, তাদের অতীত অভিজ্ঞতাও প্রীতিপ্রদ নয় এ-ব্যাপারে।

পরম্পরাগত ভাবেই ভারতের বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে পাকিস্তান অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে। পূর্ব সীমান্তে মিজো ও নাগা বিদ্রোহীদের তারা নানাভাবে মদত দিয়েছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং হাসিনা ওয়াজেদ ক্ষমতায় আসবার পরে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হতে পারে; পাকিস্তান এখনও সাহায্য দিচ্ছে পাঞ্জাবের খালিস্তানি এবং উগ্র শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, সেইসঙ্গে কাশ্মীরে উগ্র জেহাদিদের তো বটেই।

ভারত কখনও পাক-প্রবর্তিত গুপ্তাঘাত, চোরা সংহার, বিদ্বেষবিষ প্রবর্তনার পথ অবলম্বন করেনি। ইন্টেলিজেন্স প্রদত্ত তথ্যের উপরে নির্ভর করে, অথবা সিকিউরিটি বর্ধিত করে আমরা উগ্রবাদীদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করি। কুকর্মের প্রতিশোধ নেবার প্রশ্ন এলে আমরা আইনসঙ্গত ভাবে ব্যবস্থা নিতে চাই, সিধে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে। তাই আমরা অপেক্ষা করছি কবে পাকিস্তান কুখ্যাত ঘাতক হাফিজ সঈদকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, তাকে সরাসরি নিশ্চিহ্ন না করে। পাক-বিরোধী যে সব শক্তিগুলিকে আমরা সাহায্য করতুম তা-ও বন্ধ হয়ে যায় আই কে গুজরালের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে। পাকিস্তানে তিনি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং-এর কার্যবিধি বন্ধ করে দেন।

এটি এখন স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, পাকিস্তান তার দেশের উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না অথবা কোনও ব্যবস্থা নিতে অক্ষম। তাই হাফিজ সঈদ-এর মতো শাকুনিক হন্তারা নির্বিবাদে বিষোদগার করে যাবে।

ভারত তাহলে কী করবে? উন্নততর ইন্টেলিজেন্স-এর উপরে নির্ভর করবে? সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করবে? অথবা তৃতীয় বিকল্পের কথা ভাববে?

দিল্লির সংবাদপত্রের একজন বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে জিজ্ঞেস করছিলেন— বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত কেন শত্রু-রাজ্যে প্রবেশ করে তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছে না? প্রধানমন্ত্রীর উত্তর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের-ই প্রকৃষ্ট প্রতিফলন ঃ "ওই রকম ব্যবস্থা নিলে ভারতের নীতিবাদী ন্যায়পরায়ণ প্রতিচ্ছবির হানি ঘটবে।"

কিন্তু এখন দেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ মনে করেন যে ভারতের চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গী পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে। পুনর্বিবেচনা পদ্ধতির দুটি পন্থা ঃ প্রথমটি পাকিস্তানি পদ্ধতি— যেমন জেহাদিরা ভারতে এসে নির্বিচার পাশবিকতায় নারী-শিশুদের হত্যা করে। দ্বিতীয়টি ইজরায়েলি পদ্ধতি— যা পশ্চিমী শক্তিবর্গ পছন্দ করে ৯/১১-র ঘটনার পরে।

পশ্চিমী শক্তিগুলি উগ্রপন্থীদের অর্থ সাহায্য করে না, কিন্তু একই সঙ্গে তারা আইনের নৈতিক দিকগুলির দিকে তেমন দৃষ্টি দেয় না। আমেরিকা উগ্রপন্থী দলগুলিতে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে উৎসাহ দেয়, অপহরণ এবং অদৃশ্য করায় বিশেষ উগ্রপন্থীদের এবং উগ্রপন্থীদের বিনাশের জন্যে বন্ধুত্বপূর্ব গুপ্ত সংস্থার সাহায্য নেয়।

ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন— এই দৃষ্টান্ত ভারতের অনুসরণ করার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ রয়েছে।

কান্দাহারে আই সি— আটশো চৌদ্দ বিমানের যাত্রীদের বিনিময়ে পাক-উগ্রপন্থীদের মুক্তির কথাই ধরুন। এই তিন উগ্রবাদী পাকিস্তানে পৌঁছলে তাদের 'বীরের সম্বর্ধনা' দেওয়া হয়। ভারত কি এই তিন জঘন্য অপরাধীকে অনুসরণ করে নিয়ে আসতে পারত না, বা নিধন করতে পারত না? তা হলে সেটা অন্য উগ্রবাদীদের এক উচিত শিক্ষা হোত!

একইভাবে, আমরা কি জানি না মুম্বাইয়ের ২৬/১১-র গণহত্যার পান্ডা কারা? এবং কোথায় তাদের আবাস? আমরা কি অপেক্ষা করব কবে পাকিস্তান তাদের কাঠগড়ায় তুলবে, অথবা ভারতের হাতে তুলে দেবে? যা কখনই ঘটবে না। আমরা কি একটি 'হিট টিম' পাঠাতে পারি না? বম্বে ব্লাস্টের প্রধান পান্ডা দায়ুদ ইব্রাহিমের আবাস কোথায় তা সবার জানা।

দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান যে ভাবে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থী আতঙ্কবাদীদের অর্থ-অস্ত্র সাহায্য দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ-অগ্নিকাণ্ড-গণহত্যা ঘটাচ্ছে— আমরা কি পারি না সেইভাবে সিন্ধি-বালুচি-মোহাজিরদের সাহায্য করতে? পাকিস্তানে এরা সবাই পাঞ্জাব মুসলমানদের শাসনে অতিষ্ঠ-অত্যাচারিত হয়ে আসছে।

সমস্ত পৃথিবী জানে— ভারত শান্তিকামী দেশ। কিন্তু চিরবৈরী পাকিস্তানের ক্রমাগত অসহনীয় অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় ভারতের দেশভক্ত মানুষের মনে যে-সব প্রশ্ন জেগে উঠছে— তারই কিছু উপরে লিপিবদ্ধ করা হলো।

সবশেষে, পুণেতে সন্ত্রাসী হানার পরে (মুম্বাইয়ের পরে) এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে পাকিস্তান তার সন্ত্রাসবাদী শাকুনিক বিভীষিকা ভারতের বিভিন্ন জনপদে সংঘটিত করে যাবে। কিছু ভারতীয় র‍্যাডিকাল মুসলমান গোষ্ঠীকে তারা অর্থ সাহায্যসহ সশস্ত্র করে তুলছে যাতে পাকিস্তান বলতে পারে এরা তো ভারতীয়, ভারতের একটি সম্প্রদায়ই দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে সচেষ্ট। আমরা কি সেই ভয়াবহ দিনের জন্যে অপেক্ষা করব, নাকি সন্ত্রাসবাদকে দমনের জন্যে অন্য বিকল্পের কথা ভাবব?

সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে

(৮ পাতার পর)

ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ৪২টি রাস্তার কাজ চলছে জোর কদমে।

চীন সীমান্তের রাজ্যগুলোর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও সময়ই চীন এই রাজ্য দখলের জন্য আঘাত হানতে পারে। এই আঘাত আসবে উত্তর সিকিমের ফিঙ্গার টিপ, দক্ষিণ সিকিমের চাম্বে উপত্যকা, অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং এবং সিওয়াং উপত্যকা থেকে। তা ছাড়া নাস্তিক চীন সরকার হঠাৎ বৌদ্ধ ভক্তি দেখিয়ে বলছে, লাসার পোটলা প্যালেসের পরে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ মঠ তাওয়াং-এ। চীনের দাবি, তিববত চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অরুণাচল প্রদেশও তিববতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই চীন তাদের মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশকে যুক্তও করেছে।

দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ ভারত সরকারের আত্মরক্ষার জন্য সচেতন মানসিকতা দেখে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে চীন। তারা ভারতের পিঠে ছুরি মারার পুরোনো কৌশলকে কাজে লাগাতে শুরু করে দিয়েছে কূটনৈতিক পাশা খেলা। চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হ্যানয়ে বৈঠকে মিলিত হলেন। ভারত দর্শনের জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চীন ভ্রমণের শিষ্টাচারের কথা বলতে ভুলে গেলেন।

শুধু সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রস্তুতি দেখেই চীনের কিন্তু এই কূট কৌশল নয়। ভারত-জাপান নৌ-মহড়া; আমেরিকার সঙ্গে ভারতের পরমাণু চুক্তি; পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে চীনা ফৌজের তৎপরতা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ, এমনি নানা রকম কঠোর মানসিকতার পরিচয় পেয়ে চীনের নূতন করে এই বন্ধুত্বের অভিনয়। এর সঙ্গে যুক্ত করুন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তিন দিনের ভারত সফরের সদ্য সমাপ্ত কর্মসূচি। তবে যে যেভাবেই ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুক না কেন, ভারত চিরকালই বাস্তবের আলোতে নিজের অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। চীনের একনায়কত্বাধীন ক্ষমতাকেন্দ্র গণতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়। আবার গণতন্ত্রের শক্তির সাফল্যও একনায়কত্বাধীন চীনের পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়। তাই গণতান্ত্রিক শক্তিকে চাপের মুখে রাখাই চীনের প্রধান লক্ষ্য। কারণ গণতন্ত্রের শক্তির সাফল্য চীনের অভ্যন্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার মতো বিপর্যয় আনতে পারে। তাই গণতান্ত্রিক দেশের আর্থিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার জন্য নানারকম ছলচাতুরি করে চলছে চীন। ভারতের উত্তর সীমার দেশ তিববত নেপাল ভূটান একের পর এক গ্রাস করে (কখনও কূটনৈতিকভাবে, কখনও গায়ের জোরে রাজনৈতিকভাবে) এগিয়ে চলছে চীন। ভারতের অভ্যন্তরেও চীন পন্থী বিষবৃক্ষের অভাব নেই। ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর চীনের প্রতি অতি বিশ্বাস দেখালে তা সব সময়েই বিপদের সৃষ্টি করবে।

অনাগত মহাসংঘর্ষ

গরুপাচার এবং জেহাদি কায়দায় ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়ে জনবিস্ফোরণ ঘটানো ও কথায় কথায় মুসলিম লীগের কৌশলে তুচ্ছ কারণে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জিইয়ে রাখার বিষক্রিয়া থেকে আমাদের দেশ মুক্ত হতে পারছে না। ১৯৬৪ সালে 'হজরত বাল' চুরিকে কেন্দ্র করে সেমি-রায়টের পাঁয়তারা, গোধরায় ট্রেন পুড়িয়ে পরিকল্পিত হিন্দু-নিধন, কাশীতে বেণীমাধবের ধবজা ধবংস তথা বৈদেশিক আক্রমণকারী বর্বর বাবর কর্তৃক রামজন্মভূমিকে ম্লেচ্ছ কায়দায় অপবিত্রকরণ ভারতীয়দের মনে আজও ক্ষত হয়ে আছে। এই ক্যান্সার নানা কায়দায় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে খণ্ডিত এক শ্রেণীর সেকুলারবাদীদের শাসনে আজও অব্যাহত। সংখ্যালঘুদের জন্য এসব করতে হবে বলে জনৈক মোল্লা মন্ত্রীও ধমকে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে দেশবাসীকে সরব হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। নইলে ভয়ানক দিন আগত প্রায়, দেগঙ্গা-কাণ্ড তারই প্রমাণ।

—আদিত্য রঞ্জন ঘটক, বারাসাত, কলকাতা।

মমতাকে হত্যার চেষ্টা

গূঢ়পুরুষ, স্বস্তিকার ৬২ বৎসর ৫২ সংখ্যায় (২৩.৮.২০১০) বলছেন, রাজনৈতিক হত্যার উদাহরণ নেই। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অলীক নাও হতে পারে। মমতার উপর তিনবার দৈহিক আক্রমণ হয়েছিল— থানায় তাঁকে বুকে আঘাত, একবার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, একবার প্রহার। তাঁকে এজন্য চিকিৎসাও করাতে হয়েছিল, তিনি নন্দীগ্রাম নিয়ে ২৬ দিন অনশন করে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছান, শুভানুধ্যায়ীদের চাপে, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন ত্যাগ করেন, কিন্তু আশ্বাস অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

গুর্জন্ত সিং-এর গাড়ীর ব্রেক খারাপ হয়েছিল—কিন্তু তা কি করে ১নং লেন থেকে ৪নং লেনে গিয়ে মমতার রক্ষী পুলিশের গাড়ীকে, যা মমতার গাড়ীকে আড়াল করে করে চলছিল, প্রচণ্ড ধাক্কা মারে এবং সেই গাড়ীই মমতার গাড়ীকে ধাক্কা লাগায়। চালক এক মিনিটেই টের পেয়ে যায় যখন ব্রেক কাজ করে না। এক্সিলেটর ছেড়ে দিলে কিছুদূর গিয়ে তা থেমে যাবে—ডানে বামে যাবে না। তা শুধু স্টিয়ারিং এর দ্বারাই হয়। ওটাও খারাপ ছিল, তা শোনা যায়নি।

পাঞ্জাবের গাড়ী হলে আলিপুর মোটর ভেহিকেলস্-এর Fit Certificate আনতে যাওয়ার ত কথা নয়। গূঢ়পুরুষ একটু আলোকপাত করবেন কি?

—ভূপতিচরণ দে, সার্ভে পার্ক, কলকাতা।

নিরাপত্তাহীন হিন্দু

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। কারণ একটাই, সেটা হলো—আমি হিন্দু। ৮০০—১০০০ বছরের যে হিন্দুর পরাধীনতা আর মুসলমান ও খৃস্টানের বর্বরোচিত অত্যাচারের ইতিহাস যেন আমাকে বেশী করে বিচলিত করেছে। যাই হোক, ইতিহাস আলোচনার আগে ঘটনাটা বলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উস্তি থানার অন্তর্গত পিয়াজগঞ্জ গ্রামে মুসলিম পঞ্চায়েত প্রধান, মুসলিম পঞ্চায়েত সদস্য এবং থানার মুসলিম বড়বাবু মিলে পুলিশ দাঁড় করিয়ে আইন এবং সংবিধান অমান্য করে রাতারাতি হিন্দুদের পুরানো কালী মন্দিরের সামনেই মাত্র ৪০-৫০ ফুটের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ করে ফেললেন। আর গ্রামের হিন্দুরা ১৫ বছর ধরে কোর্ট-কাছারি, আইন, পুলিশ, প্রশাসন করে বস্তা বস্তা কাগজের ঢিপি তৈরী করেছেন।

চিন্তার বিষয় হলো যে, হিন্দুদের পাশে তাহলে আছে কে? শ্রীচৈতন্যর ভক্তগণ কি হিন্দুদের কথা ভাবে? তারা কি হিন্দুর নিরাপত্তা দিতে পারবে? আমি নিশ্চিত এটা অবাস্তব। তাহলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কি হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে পারবে? না; তেমন কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। এরা তো দেখছি সেবা আর শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। তাহলে রামকৃষ্ণ মিশন কি পারবে? না! এরা তো নিজেদের হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দিতে চায় না। সি পি এম, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং এখন হিন্দুর সব থেকে বিপদজনক হলো তৃণমূল কংগ্রেস। এরা সকলে মুসলিম তোষণকারী। সুতরাং ভারতবর্ষে বিশেষ করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ১৯৪৬-৪৭ সালে কচুকাটা হতে হতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেও আগামী দিনে কি আর হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবে? আজও কি মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে হিন্দুরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়? জানি না হিন্দুর জন্য আর কোনও দিন শিবাজী মহারাজ বা রাণাপ্রতাপ সিংহ এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করবে কিনা!

—বিজয় চন্দ্র দে, ডায়মন্ডহারবার।

পশ্চাৎপদের (OBC) সংখ্যাবৃদ্ধি

দেখা যাচ্ছে, আজ এই স্বাধীন ভারতে কি সরকার, কি রাজনৈতিক দলগুলির যত কদর তা এই S.T., S.C. O.B.C. সম্প্রদায়ের জন্য। সেখানে মুখার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী, ঘোষ, বোস, দাসগুপ্ত, সেনগুপ্ত ইত্যাদি পদবীধারীরা একেবারেই অচ্ছুৎ। তাঁদের নামও কেউ মুখে আনে না। কারণ তাঁদের বহু দোষ। প্রথমত, ধরে নেওয়া হয় তাঁদের কোন সমস্যাই নেই, নেই কোনও বেকার সমস্যা, নেই কোনও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ঝামেলা, নেই কোনও গৃহ সমস্যা, নেই কোনও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা। তাঁরা সবাই যেন টাটা, বিড়লা, ধনকুবের, জজ্, ম্যাজিস্ট্রেট!

দ্বিতীয়ত, তাঁদের প্রধান দোষ যে তাঁরা পরিবার এক সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন— ভোটার সংখ্যা বাড়ানোর দিকে তাঁদের একদমই কোন নজর নেই। তৃতীয়ত, তাঁদের আরও দোষ যে তাঁরা ছেলেমেয়েদের ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য প্রাণপাত করেন। চতুর্থত, তাঁরা ছেলেমেয়েদের ১৫/১৬, ১২/১৩ বছরে বিয়ে দিয়ে ডজন ডজন ভোটার উৎপাদন করেন না।

অপর দিকে আগেই বলেছি যে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে S.T., S.C. O.B.C. বা "পিছিয়ে পড়াদের" কদর অনেক বেশী। কারণ তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী। পরিবার পরিকল্পনার কথা তাঁরা শুনেছেন কিনা সন্দেহ। তারপর নিত্য নতুন বিভিন্ন সম্প্রদায় এই তালিকায় যোগ দেওয়ার জন্য লাইন দিচ্ছে। আর রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভোটার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তাদের মদত দিয়ে চলেছে। ১৯৫০ সালে ত্র.ব., ত্র.ট্র. কোটা ছিল ১৭ শতাংশ, তাও মাত্র দশ বছরের জন্য। তারপর তার মেয়াদ যেমন দশ বছর অন্তর বেড়েই চলেছে (এবং অনন্তকাল ধরে তা বাড়বেই) তেমন নতুন নতুন সম্প্রদায় তাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ব্যতিক্রম শুধু "সামনে চলা" অথবা "উঁচু" জাত। ভি. পি. সিংহের আমলে এই তালিকায় যোগ করা হয়েছে "O.B.C." অর্থাৎ "অন্যান্য পিছিয়ে পড়া" সম্প্রদায়। হালে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে সব মুসলিমদের তো "পিছিয়ে পড়ার" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ পর্যন্ত হয়েছে ৫০ শতাংশ। কিন্তু ১০ শতাংশ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে যখন তা ৫০ শতাংশ হয়েছে তখনও ১০০ শতাংশ হতে আর বেশী দেরী হবে না। হাতের কাছে কেরলের দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে আরবের পেট্রো ডলারের কল্যাণে মুসলিমদের রমরমা অবস্থা সত্ত্বেও তাদের সবাইকে "পিছিয়ে পড়া" ঘোষণা করা হয়েছে। তখন পশ্চিমবঙ্গে তা করতে বাধা কোথায়? আর মুসলিমদের দাবীও তাই। তাদের ভোট পেতে হলে সে দাবী মানতেই হবে।

চিঠিপত্র

দেখছেন না, এই "পিছিয়ে পড়ার" তালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য দেশের সর্বত্র কি রকম প্রতিযোগিতা হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। আর হবে নাই বা কেন। এটা যে এখন ভারতের রাজধর্মে পরিণত হয়েছে। এই ধর্মে যোগ দিলে চাকরী-বাকরী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া খুবই সোজা। তার জন্য বেশী লেখাপড়ার দরকার নেই। তাই এই নতুন ধর্মে যোগ দেওয়ার অধিকার নিয়ে রাজস্থানে মীনা ও গুর্জ্জরদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পুলিসের গুলি বর্ষণ লেগেই আছে। উত্তরপ্রদেশে জাঠরা ক্ষেপে উঠেছে।

আরও লক্ষণীয়, এক একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা "সফল" হচ্ছে, আর "S.T., S.C. O.B.C." বা "পিছিয়ে পড়ার" সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে। ১৯৫০ সাল থেকে দশটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা "সফল" হয়েছে। আর ত্র.ব., ত্র.ট্র. থ.চট্র. "পিছিয়ে পড়ার" সংখ্যা ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৬৯ শতাংশ-এ পৌঁছেছে অর্থাৎ প্রতি পাঁচ বছরে ৫.২ শতাংশ। লালু-মুলায়ম-ভোলা-মায়াবতীর আশা, মুসলিম সমাজ এই "পিছিয়ে পড়ার" দলে সামিল হওয়ায় তাদের সংখ্যা ২০১১ সালে ৯০ শতাংশ-এ দাঁড়াবে। তাই জনগণনায় জাতির উল্লেখ করার জন্য তাদের এত হুমকি, এত আস্ফালন। এই হিসাবে "পিছিয়ে পড়ার" সংখ্যা ৯৯ শতাংশ-এ পৌঁছাতে মাত্র আর ১/২টি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার দরকার হবে। তখন আর পায় কে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ৯৯ শতাংশ হলে ১০০ শতাংশ হতে বাধা কোথায়? আছে, আছে। ১০০ শতাংশ হলে তো ঘোষ, বোস, মুখার্জী, ব্যানার্জী ইত্যাদি তথাকথিত "উঁচু" "সামনে চলারা" তার মধ্যে ঢুকে পড়বে। অথচ তাদের সবকিছুতে ব্রাত্য করার জন্যই তো এই রিজার্ভেশন কোটা। ১০০ শতাংশ হলে তো সব প্ল্যানই বানচাল হয়ে যাবে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই তথাকথিত "উঁচু" সামনে চলার" জন্য এই ১ শতাংশ বরাদ্দ রাখতেই হবে।

অতএব আপনি যদি নিজের, পরিবারের, সন্তান-সন্ততিদের মঙ্গল চান, যদি চান তারা লেখাপড়া শিখে চাকরী-বাকরী করুক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হোক তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে বেশী নজর না দিয়ে তারা যাতে S.T., S.C. না হোক অন্তত নিজেদের "পিছিয়ে পড়া" ঘোষণা করতে পারে তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখুন। নচেৎ চ.ট্র., ত.ট্র., পাশ করে কিস্যু হবে না।

—সুহাস বসু, বেহালা, কলকাতা।

স্কুলে নমাজ অশনি সংকেত

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১০ অক্টোবর তারিখে প্রথম শ্রেণীর এক দৈনিক পত্রিকায় একটা খবর পড়ে চমকে উঠলাম। এও কখনও সম্ভব! খবরটা এই যে দেশের সমস্ত স্কুলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টানতে কেন্দ্র সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে, তাদের প্রধান উৎসব ঈদ পালন ও নিয়মিত নমাজ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে স্কুলগুলোতেই। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীকে ধর্ম আলোচনার দ্বারা উৎসাহ দিতে মৌলানা-মৌলবীদেরও আগমন ঘটবে। কেন্দ্রের ব্যাখ্যায় সংখ্যাগুরু ছাত্রদের নিস্পৃহ ব্যবহারে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ও নিরুৎসাহিত বোধ করে। তাদের জন্য পরিবেশকে অনুকূল ও উৎসাহব্যঞ্জক করতেই উপরিউক্ত ব্যবস্থা।

অপরিণামদর্শী কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ যে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের অশনি সঙ্কেত তা 'ঘরপোড়া গরু' হিন্দু মাত্রেই বুঝবেন। ইতিমধ্যে শিক্ষায়তনের বিধবস্ত পরিবেশকে আরও অসুস্থ এবং অশান্ত করে তুলতে মাথার ঘায়ে পাগল...কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের চক্রান্তমূলক ওই আদেশনামা যা ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে সংখ্যালঘু তোষণের জঘন্যতম উদাহরণ। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের এই অপকর্মের ব্যাখ্যা যে অযৌক্তিক তার প্রমাণ এই যে শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম সমাজেই অর্থকরী আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা প্রায় শূন্য এবং তা তাদের ধর্মীয় কারণেই। তাদের দৃঢ় ধারণা এই যে কেবলমাত্র কোরান পাঠের মাধ্যমেই তারা যখন পৃথিবীতে ছোট বড় পঞ্চাশটার বেশী দেশ দখল করতে পেরেছে তখন ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষা নিতে যাবে কোন দুঃখে? এই কারণেই গত শতাধিক বছরের আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে মানব কল্যাণে উজ্জ্বল অবদান রাখা মুসলিম মনীষীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা। অথচ এই সময়খণ্ডে ওই সম্প্রদায়ের নামকরা ধর্মীয় নেতার প্রাদুর্ভাব নজরকাড়া। স্বাধীনতার অর্ধ-শতাধিক বছর ধরে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কেন্দ্র সরকারের সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিমদের উন্নতিকল্পে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা 'ভস্মে ঘি ঢালা' হয়েছে। আধুনিক চিন্তায় আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম পণ্ডিতগণও একথা স্বীকার করেন এবং এনিয়ে তাঁরা বেশ উদ্বিগ্ন। এর জন্য যে মাদ্রাসা শিক্ষা মূলত দায়ী তাকেই প্রশ্রয় ও বিস্তারে সাহায্য করে কেন্দ্র সরকার মুসলিম সমাজের ক্ষতিসাধনই করবে। সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে মাদ্রাসায় প্রাপ্ত যে শিক্ষা

জনমত

তাদেরকে আধুনিকতামুখী করতে ব্যর্থ, বিচ্ছিন্নভাবে তার অনুষ্ঠান কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। সরকারের এই পদক্ষেপ অবশ্যই অভিসন্ধিমূলক।

এরপর, বিপদ অন্যদিকে থেকেও আসতে পারে। অন্যান্য সংখ্যালঘু ছাত্ররাও যদি স্কুলে তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেব-দেবীর পূজা-উপাসনার দাবি তোলে এবং যা অযৌক্তিক হবে না মোটেই, তখন স্কুলে আর বিদ্যাচর্চার পরিবেশ থাকবে তো? ধর্মকেন্দ্রিক অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে না? এমনিতেই মিড্-ডে-মিলকে কেন্দ্র করে স্কুলগুলোতে ডামাডোল অবস্থা। নিত্য মচ্ছবের ব্যবস্থা। লেখাপড়া ব্যাক্‌ডোর দিয়ে পালিয়ে দেশছাড়া।

তাছাড়া প্রতি শুক্রবার নমাজ পাঠের দিন ধার্য হলে বছরের বাহান্নটা এবং প্রতিদিন হলে দুই শতাধিক দিন নমাজ, ঈদ পালন হলে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা তাদের তেত্রিশ কোটি বা শ্রেণীর দেব-দেবীর পূজা পালনের দাবি তুলতে পারে যা অস্বীকার করা সম্ভব হবে কি? দাবি পূরণ হলে বিদ্যালয়গুলো "পাঠশালা" না থেকে "ধর্মশালায়" রূপান্তরিত হবে। এই দাবি দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে, আর রাজনৈতিক দলগুলো তো এটাই চায়— "ঝটাপটি লাগিয়ে দে মা, লুটে পুটে খাই।"

স্কুলে দেবী সরস্বতীর পূজাকে নমাজ পড়ার পক্ষে যুক্তি ধরলে জেনে রাখা উচিত যে স্কুলগুলো 'বিদ্যালয়' এবং সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই তাঁর পূজা, আরাধনা যুক্তিসঙ্গত এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন সকলের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু আল্লা নিরাকার এবং কোনও বিশেষ তত্ত্বের দেবতা তিনি নন। সে রকম ক্ষেত্রে আল্লার উপাসনার অনুমোদন মুসলিম ছাত্রদের মনকে বিক্ষিপ্তই করবে। অবস্থার কোনও হের ফের হবে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট হল ঘরে খৃস্টানদের বিদ্যার দেবী এথেনার প্রতিষ্ঠিত মূর্তির বিরুদ্ধে উপস্থিত কোনও সম্প্রদায়ই আপত্তি তোলেননি। পরবর্তী আপত্তি, সরস্বতী পূজা হয় বছরে মাত্র একদিন, নমাজপড়ার অনুষ্ঠান সারা বছর ধরে, প্রতিদিন। ফলে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করবে যা অবশ্যই আপত্তিকর। সেক্ষেত্রে সারা বছরই সরস্বতী বন্দনা ও বিশেষ তিথিতে বিশেষ পূজা, উপাসনার দাবি উঠতে পারে। মাঝে মাঝে হিন্দু ধর্মগুরু দ্বারা ধর্ম আলোচনারও প্রয়োজন হবে। এরপর স্কুলগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় থাকবে তো? পরিবেশ উত্তপ্ত হলে পুলিশ পাহারায় স্কুল চালাতে হতে পারে।

ভারতীয় এবং ভারতে বিকশিত চিত্রশিল্পের কাহিনী

।। **রবীন সেনগুপ্ত**।।

ইংরেজরা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দখল করার পর এদেশের নানা বিষয়ে নানা রকম ধারণা প্রচার করতে থাকে, তার মধ্যে কিছু ধারণা সঠিক হলেও অধিকাংশ ধারণাই ছিল বেঠিক। ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরম্পরাকে প্রথম দিকে বৃটিশরা যথেষ্ট নীচু চোখে দেখত। হঠাৎ অজন্তা-ইলোরার গুহা চিত্রগুলি আবিষ্কার হওয়ার পর ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে।

খৃস্ট জন্মের দুই-আড়াই হাজার বছর আগেও যে এদেশে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল তা হরপ্পার মাটির পাত্রের মধ্যে কিছুটা ধরা রয়েছে। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্ত থেকে জানা গেছে যে সে যুগেও চিত্রকলার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ভয়ঙ্কর অগ্নির একটি শান্তরূপ চামড়ার উপরে এঁকে উপাসনা করার মন্ত্র আছে বেদে। একটি জাপানী পুঁথিতে বৈদিক ঋষিদের চিত্র পাওয়া গেছে। একটি জৈন কল্পসূত্রের পাণ্ডুলিপিতেও বৈদিক চিত্রধারার এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হয়েছে—দেব-দেবীদের রথ, প্রাসাদ ও আশ্রমগুলি রত্নখচিত কলস, সুন্দর দর্পণ— ইত্যাদির সাথে সাথে সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা দ্বারাও শোভা পেয়ে থাকে। স্কন্দ পুরাণে সিদ্ধান্ত আছে যে—যারা মন্দিরের দেওয়ালে চিত্র অঙ্কন করে শোভা বর্ধনে সহায়তা করে তারা মৃত্যুর পর সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। সিন্ধু দেশের কাছে রোবুকার রাজকুমারের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান উপহার পেয়ে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের বাণী সমন্বিত একটি চিত্র উপহার হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন বলে শোনা যায়। রাজা বিম্বিসারের একটি রতি চিত্রের সংগ্রহ শালা ছিল। বুদ্ধ দেব তাঁর শিষ্যদের সেটির দর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। বৌদ্ধ মঠগুলিতে কি কি ছবি আঁকা যেতে পারে সে বিষয়েও বুদ্ধ দেব উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ছাড়াও হিন্দু ও জৈন চিত্রকলার প্রসার ঘটেছিল। কর্ণাটকের বাদামীর গুহামন্দিরে হিন্দু চিত্রকলার উন্নত নিদর্শন রয়েছে। জৈন চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে তামিলনাড়ুর সিওন বসানের জৈন মন্দিরে। কাঞ্চি পুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরে, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবমন্দিরে হিন্দু শিল্পের নিদর্শন আছে।

মিনিয়েচার বা ছোট ছোট চিত্রশিল্পের জন্যও হিন্দুরা গর্ব করতে পারে। অনেকে মনে করেন যে দ্বাদশ থেকে পঞ্চ দশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রশিল্পে মিনিয়েচারের কাজ উৎকর্ষতার চরম মাত্রায় পৌঁছায়। এর পিছনে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতির প্রভাব রয়েছে বলেও কিছু সংখ্যক গবেষক মনে করেন। গুজরাটের জৈন পুঁথিচিত্রগুলি হলো মিনিয়েচারের উল্লেখযোগ্য সুসংগঠিত এক নিদর্শন।

এরপর প্রায় একই সময় মোঘল ও রাজপুত চিত্রশৈলীরও বিকাশ ঘটে। মোঘল বাদশাহ হুমায়ুন, দু'জন শিল্পীকে পারস্য থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এদের নাম হলো মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদ। এরা আকবরের আমলেও অন্যান্য শিল্পীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করেছেন যথেষ্ট। রামায়ণ-মহাভারত-গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গ্রন্থের পার্শী অনুবাদ-এর চিত্রসহ প্রকাশ ঘটেছিল এই সময়েই। যদিও পার্শী চিত্রশৈলী মোঘলদের পূর্বেই ভারতবর্ষে এসেছিল। এর প্রভাবও এদেশে অনেকদিন ছিল। তারপর ইউরোপীয়ান রেঁনেসাসের শিল্পকলার ভাবধারা এদেশের শিল্পীদের একটা বড় অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ফলতঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ পার্শী স্টাইলে অঙ্কনরীতির প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

বর্তমান রাজস্থানের মেবার এলাকায় শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার লীলা নিয়ে বিশেষ শৈলীতে প্রচুর চিত্র নির্মিত হয়। রাজপুত চিত্রশৈলী হিসাবে এগুলি যথেষ্ট খ্যাত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে এর প্রভাব শুরু হয়। ক্রমশ যোধপুর ও বিকানীর রাজ্যে প্রসার লাভ করে এই চিত্ররীতি। এই শৈলীর 'রাগমালা' চিত্রগুলির নাম শিল্পের জগতে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

এই সময়েই দক্ষিণ ভারতে পারস্য ও তুর্কিস্থানের শিল্পীদের প্রভাবে এমন এক চিত্ররীতির জন্ম হয়, যেখানে কিছুটা স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। সুলতানদের দরবারে ওই সকল দক্ষিণী চিত্ররীতির উদ্‌গাতা শিল্পীদের কদরও ছিল যথেষ্ট। পাহাড়ী এলাকার অধিবাসীদের কারো কারো মধ্যে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট চর্চা ছিল। তাঁরা বহুযুগ থেকেই শিল্প সৃষ্টি করে আসছেন। কিন্তু পাহাড়ী চিত্রকলা, কাংড়া শৈলীর আর্ট এইসব শব্দগুলি বিশেষ ভাবে মর্যাদা খুব বেশী দিন হলো পায়নি। নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠনের পর মোগল শৈলীর কিছু কিছু শিল্পী পালিয়ে গিয়ে হিমাচলের হিন্দু রাজাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে মোগল ও রাজপুত রীতি মিলিত হয়ে পাহাড়ী চিত্রকলা বিশেষ করে তিনটি অঞ্চ লে বিকাশ লাভ করে। এই অঞ্চ ল তিনটির নাম হলো— রাসোলি, গুলের ও কাংড়া। গুলেরে-র শিল্পীরাই কাংড়ার রাজা সংসার চাঁদের দরবারে এসে চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন দেখাতে সক্ষম হন।

আধুনিক যুগে ভারতীয় শিল্পে রেঁনেসাসের-রিয়ালিস্টিক আর্ট, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, ইম্প্রেশনিজম— এসবের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের দৌলতে পটচিত্রের মতো দেশজ রীতিও চলতে থাকে। ক্যালেন্ডারে চিত্র ছাপানোর আধুনিক পদ্ধ তি আবিষ্কারের পর ভারতীয় কমার্শিয়াল শিল্পীরা পৌরাণিক দেবদেবী, আধুনিক সাধক অবতারদের ছবি, সাধারণ দৃশ্যচিত্র— এগুলিকে কিছুটা রেঁনেসাস যুগের ভাবধারা, কিছুটা দেশী ভাবধারার সমন্বয়ে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিদেশী শিল্পবিদদের মধ্যে ফার্গুসন, কানিংহাম, পার্সি ব্রাউন, হ্যাভেনা— এনারা ভারতীয় শিল্পকে খুব মর্যাদা দিতেন। হ্যাভেল সাহেবের সাথে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররীতিতে অন্যান্যদের সাথে কিছুটা যে তফাত গড়ে উঠেছিল তার মূলে শুধু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাই ছিল না, ছিল হ্যাভেল সাহেবেরও সহযোগিতা। ওই সময় দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজা রবি বর্মা নিজ-হাতে পৌরাণিক ছবি এঁকে তার প্রচার ও প্রসার শুরু করেন। রবি বর্মার আর্টের মধ্যে 'মডার্ন' ভাব না থাকায় তা অনেকে পছন্দ করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ক্লাসিক্যাল ভাবের দেবদেবী-চিত্র ও পৌরাণিক ঘটনার আবেদন যথেষ্ট। সেটাই রবি বর্মাকে হিন্দুত্ব নিয়ে গর্ব করা মানুষদের কাছে অনন্য চরিত্র করে তুলেছে। ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে যে শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে তাতে নন্দলালের প্রধান শিষ্য হন হীরাচাঁদ দুগার, বিনায়ক মাসোজী, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। এর মধ্যে বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় 'বালা' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। বাংলার চিত্রশিল্প 'বেঙ্গল স্কুল' নামে সারা দেশের চিত্ররসিকদের কাছে পরিচিতি পেতে থাকে। পরে বেঙ্গল স্কুলের ঘরানার বাইরে পরিতোষ সেন, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্তরা শিল্প সৃষ্টি করে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করতে থাকেন। বাংলার বাইরে অমৃতা শেরগিল, বাংলার যোগেন চৌধুরী, সোমনাথ হোড়, বিকাশ ভট্টাচার্যদের আর্ট দেশ-বিদেশে যথেষ্ট প্রশংসিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রায় হাজার তিনেক ছবি এঁকেছিলেন যেগুলি দেশে বিদেশে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছিল।

এইভাবে বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে ভারতীয় চিত্রকলার ব্যাপক চর্চা চলছে। কখনও তা দেশীয় রীতিতে, কখনও বিমূর্ত পাশ্চাত্যের ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে বিমূর্ত শিল্পের বা প্রতীকী শিল্পের সবটাই বিদেশী ভাবধারা পুষ্ট নয়। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, জগন্নাথ দেবের মূর্তি— এগুলি অনেকটাই 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে'র পর্যায়ে পড়ে। সম্প্রতি ইস্কনের নেতৃত্বে একদল চিত্রশিল্পী ক্লাসিক্যাল ভাবধারার ছবির মাধ্যমে গীতার বিভিন্ন বাণী, ভাগবত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের ঘটনার বর্ণনা ইত্যাদিকে অতি সুন্দর ভাবে দেশ-বিদেশে তুলে ধরছেন। এই সমস্ত ধরনের শিল্পী ও শিল্পরসিকরা ভবিষ্যতে আমাদের চিত্রের মাধ্যমে আরও আনন্দ, শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রদান করুন— এটাই একান্ত ভাবে প্রার্থনা করি।

ষোড়শ মহাজনপদ চেদি

গোপাল চক্রবর্তী।। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে উত্তর ভারতে যে ষোলটি জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল চেদি ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতে চেদিরাজ শিশুপালের কাহিনী বিবৃত আছে। পুরাণে চেদিরা যদুবংশোদ্ভুত বলে বর্ণিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চেদিরাজ্যের খ্যাতি বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে যমুনা নদীর শাখা শুক্তিমতী যা এখন 'কেশ' নামে পরিচিত, এই নদীর তীরে সোৎথিবতী নগরী চেদির রাজধানী ছিল। পৌরববংশীয় রাজা বসু চেদি রাজ্য জয় করেন এবং বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি 'চৈদ্যোপরিচর' নামে খ্যাত হন। কলিঙ্গের বিখ্যাত রাজা খারবেল (খৃঃপূঃ ১ম-২য় শতাব্দী) চেদিরাজবংশীয় বলে পরিচিত ছিলেন। ২৪৮-৪৯ খৃস্টাব্দে পশ্চিম ভারতে চেদি বা কলচুরি অব্দ নামে একটি নূতন অব্দের প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে পরাক্রান্ত কলচুরি রাজাগণ চেদি রাজ্যকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল 'ত্রিপুরী'। এই রাজবংশের লিপিতে ব্যবহৃত ও চেদিরাজ্যে প্রচলিত বলে উক্ত অব্দ চেদি বা কলচুরি নামে পরিচিত হয়। কলচুরিরাজগণ পুরাণোক্ত প্রাচীন হৈহয়-বংশীয় বলে দাবী করতেন এবং চেদির অধীশ্বর বলে পরিচিত ছিলেন।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে কলচুরিগণ চন্দ্রবংশীয় যযাতির পৌত্র হৈহয়-এর বংশধর। বিভিন্ন শিলালিপিতে অহিহয়, চেদি, কলচুরি, কটচুরি, কলৎচুরি, কুলচুরি প্রভৃতি নামেও এই রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজবংশের আদি বাসস্থান নর্মদা উপত্যকা অঞ্চ ল। প্রাচীন রাজধানী ছিল মাহিষণতি বা মান্ধাতা। অবন্তীও কলচুরি রাজ্যভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চেদি বা কলচুরি রাজ্য দক্ষিণে নাসিক, পশ্চি মে গুজরাট উপদ্বীপ ও পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ডের বৃহৎ অঞ্চ ল সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কলচুরিগণ মধ্য নর্মদা উপত্যকায় রাজ্য স্থাপন করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশ ও পরে গুর্জর প্রতিহারদের হাতে পরাজিত হয়ে চেদি কলচুরিদের রাজ্য ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। চেদির কলচুরিগণ বিভিন্ন অঞ্চ লে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। মূল চেদির কলচুরি বংশ ছাড়াও উত্তর ভারতের গোরক্ষপুর, মালব রত্নপুর এবং দহল (ত্রিপুরী)-এর কলচুরিরা উল্লেখযোগ্য। হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায় যে চেদিগণের একটি শাখা কলিঙ্গে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পেঁচার নেশায় মগ্ন ত্বিষা লাহিড়ী

অঙ্গনা

মিতা রায়

শারদীয়া উৎসবের সমারোহ এবার স্তিমিত হলো। তবে এখনও বলা যায়, শেষ হইয়াও হয় নাই শেষ। কারণ, প্রতিবেদন লেখার সময় এখনও এ বছরের শেষ পুজো জগদ্ধাত্রী ও কার্ত্তিক পুজো বাকি। যদিও লেখাটি প্রকাশিত হবার আগেই এবছরের মতো পুজো মরসুম সমাপ্ত হবে। মা বিভিন্নরূপেই একেক সময়ে আবির্ভূতা হন মর্তে। দুর্গাপুজোয় মা আসেন ঘরের কন্যার মতো পুত্র-কন্যা সমভিব্যহারে, শুধু পুত্র-কন্যা নয়, তাদের সকল বাহনরাও সঙ্গে আসেন। পৌরাণিক গাথায় দেব-দেবীর বাহনদের আলাদা গুরুত্ব আছে। সব বাহনেরই আমাদের সমাজে একটা বিশেষ স্থান আছে। তবে কার্তিকের ময়ূর আর লক্ষ্মীর পেঁচা বোধহয় বেশি জনপ্রিয়। পেঁচাকে আমাদের সমাজে অত্যন্ত মঙ্গলজনক ও শুভ প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু পেঁচাকে ভালবেসে পেঁচার প্রতি কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানাভাবে নিত্যনতুন রকমের ফেলনা জিনিস দিয়ে পেঁচা তৈরির নেশা যাঁর, তাঁর হাতের কাজের কথা না বললে একটা প্রতিভাকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তিনি হলেন ডঃ ত্বিষা লাহিড়ী।

কোনও এক শিল্প প্রদর্শনীতে ওনার পেঁচার ওপর নানা ধরনের শিল্পকর্ম দেখে বিস্মিত হই এবং আলাপচারিতায় জেনে নিই তাঁর এই ব্যতিক্রমী নেশার কথা।

ত্বিষা লাহিড়ী ব্যক্তিগতভাবে একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী। এম এস সি পাশ ক'রে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে ইউটেরাস- ক্যান্সারের ওপর রিসার্চ করেন। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন পেঁচার প্রতি আগ্রহ জন্মাল এবং কীভাবে, উত্তরে জানালেন — সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি যখন এম এস সি পড়ছি, তখন বিভিন্ন পশু-পাখির ওপর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে হোত। তো বিভিন্ন ঘরে সব পাখিদের রাখা হোত। একদিন যখন পেঁচার ঘরে ঢুকেছি, চারপাশ থেকে পেঁচাগুলো খাঁচা থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসতে খুব ভয় পে য়ে গেলাম। এরপর থেকে যতবার গেছি ওদের পর্যবেক্ষণ করতাম। ওদের চোখ দুটো এমনই মনে হয় যেন সব বুঝছে। সবচেয়ে আমাকে অবাক করেছিল ওদের ১৮০° ডিগ্রি মাথা ঘোরানোর ব্যাপারটা। এরপর থেকেই পেঁচার প্রতি আমার একটা কৌতূহল জাগলো।

সেইসঙ্গে জানালেন বিভিন্ন দেশ-বিদেশে পেঁচাকে সেখানকার মানুষজন কী দৃষ্টিতে দেখেন।

'আমি পরিবেশ বিজ্ঞানী। কাজেই বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। সেখানকার পরিবেশ, সেখানকার মানুষদের জীবনযাত্রা জানতে হয়েছে। তখন জানতে পেরেছি কোন্ দেশ পেঁচাকে কী দৃষ্টিতে দেখে। কয়েকটি দেশের কথা জানাচ্ছি। যেমন, গ্রিক মাইথোলজিতে বলে, দেবী অ্যাথেনা হলেন রাত্রির দেবতা। তাঁর হাতে সবসময় পেঁচা থাকে, যেটি জ্ঞানের প্রতীক। পেঁচা নাকি প্রকৃত সত্যটা বুঝতে পারে। চীনদেশে বিশ্বাস, পেঁচা নাকি বিদ্যুতের শককে রোধ করে, তাই তাদের ঘরে ঘরে পেঁচা থাকে। আলেকজান্দ্রিয়াতে তো বিরাট পেঁচার মূর্তি-ই রয়েছে। জাপানে পেঁচাকে খুব সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখা হয়। জাপানিরা তাদের পোশাকে পেঁচার পালক লাগায়। পেঁচা নাকি মানুষ আর দেবতার মধ্যে মিডিয়ার কাজ করে বলে তাদের বিশ্বাস। অন্যদিকে আমেরিকা ও আফ্রিকায় উপজাতিদের মধ্যে পেঁচা কিন্তু অমঙ্গলের চিহ্ন। যদিও ওদের ধারণা, পেঁচা ভবিষ্যত বলতে পারে। যাইহোক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, মঙ্গল-অমঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামান না ত্বিষা লাহিড়ী —ওনার কাছে পেঁচার চোখ জোড়া আকর্ষণীয়। উনি মনে করেন, পেঁচার চোখ দুটোর সঙ্গে মানুষের চোখের সাযুজ্য আছে। অন্ধকারে এদের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পেঁচা তৈরির শখ সেই থেকে শুরু। যত কিছু ফেলনা জিনিস দিয়ে অসংখ্য পেঁচা তাঁর সংগ্রহে। ছেঁড়া জুতো, কম্পিউটারের মাউস, ভাঙা প্লেট, তার, পাট, সুপারির খোল, হারপিকের কৌটো, ভাঙা কুলো, ঝিনুক, ছেঁড়া কাপড়, তুলো— কি নেই তাতে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় সৃষ্টি একটা বিরাট পেঁচার গায়ে ছোট ছোট নানা ধরনের পেঁচা তৈরি। এটা করতে বেশি সময়ও লাগে না। সংসারের কাজ, পড়ানো সব কিছুর মধ্যেই পেঁচা তৈরির এক অদম্য নেশা তাঁর। ছোটবেলা থেকেই ভাইবোনেরা কিছু না কিছু হাতের কাজ করতেন। নানাধরনের শিল্পকর্মে নিপুণা এই মহিলা হঠাৎই পরিণত বয়সে পেঁচার নেশায় মশগুল হয়ে অনবদ্য সব পেঁচা তৈরি করতে শুরু করেন। ওনার সংগ্রহে প্রায় তিনশোর মতো পেঁচা আছে। কিন্তু আশ্চর্য রকমের হলো, প্রত্যেকটি পেঁচা প্রত্যেকের থেকেই আলাদা। পেঁচার সংগ্রহ নিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরতে প্রদর্শনীও করেছেন। এ বিষয়ে জানালেন— প্রথম প্রদর্শনী হয় অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে। এর আগে ছোট ছোট ঘরোয়া প্রদর্শনী হয়েছে। ২০০৮-এ বড় করে প্রদর্শনী হয় এন ই ডব্লুউ এস-এর উদ্যোগে। ২০০৯-তে অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস-এর সেন্ট্রাল গ্যালারিতে, ২০১০-এ গগণেন্দ্র প্রদর্শনী শালায়।

ভবিষ্যতে এত কাজ কী করবেন জানতে চাইলে বললেন— এখন যেমন আছে থাকবে। মাঝে মাঝে পেঁচা তৈরি ক'রে কাউকে গিফট করি। ভবিষ্যতে বাড়ির লোক যা করে করবে। সত্যিই অদ্ভুত এক নেশায় মগ্ন ত্বিষাদেবী।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ১৪

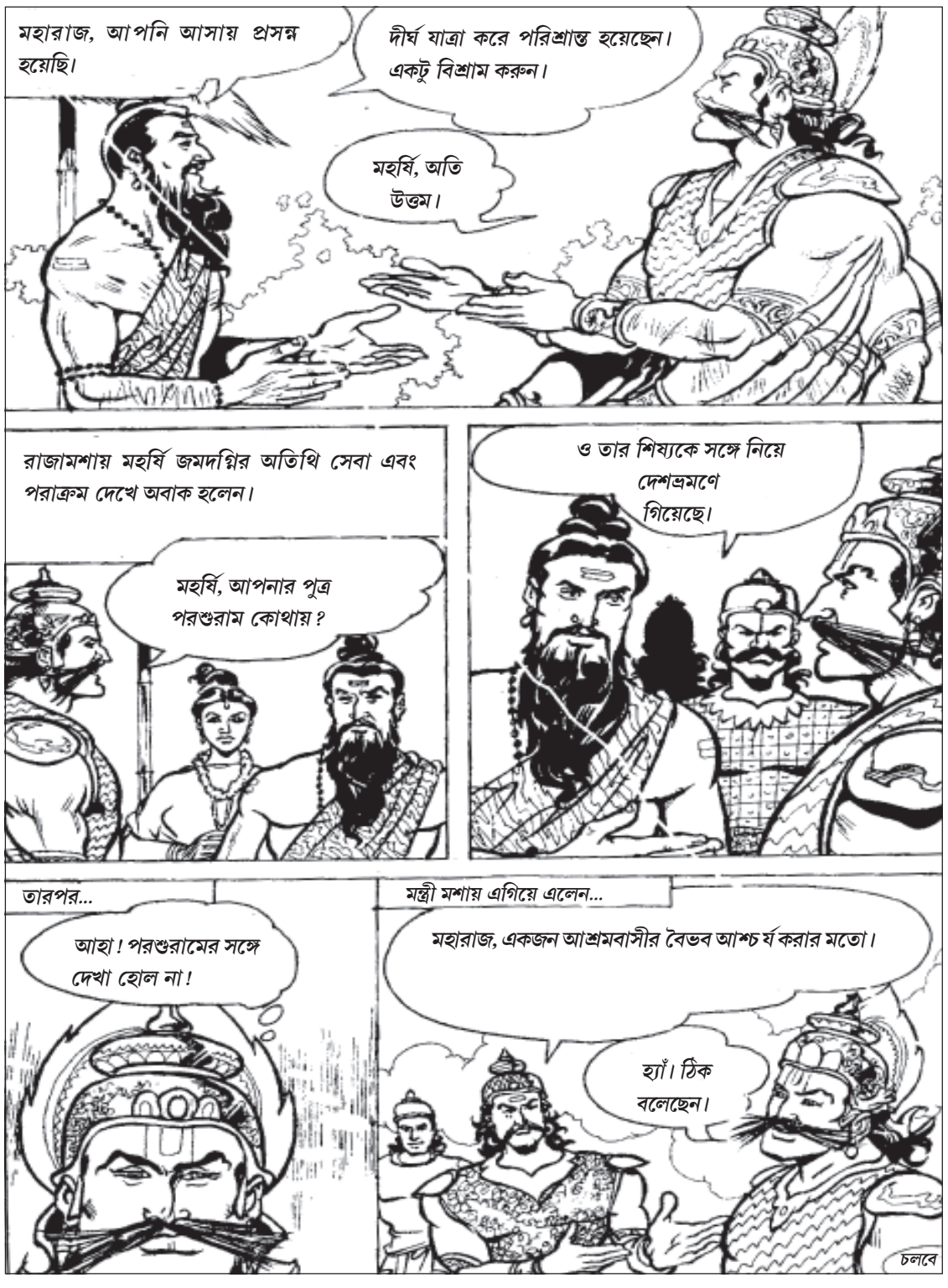

জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তি দিবস

জম্মু-কাশ্মীর উদ্‌যাপন সমিতির মাধ্যমে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও সমস্ত জেলা কেন্দ্রে ২৬ অক্টোবর কাশ্মীর ভারতভুক্তি দিবস বিভিন্ন পথসভার মাধ্যমে পালিত হয়। কোচবিহারের কাছারিমোড়, জলপাইগুড়ির কদমতলা, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়, রায়গঞ্জ, মালদা শহর, চাঁচলের নেতাজী সুভাষ মোড়, রঘুনাথপুর সহ মোট ১২টি স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভাগুলিতে প্রান্ত স্তরের ১০ জন কার্যকর্তার উপস্থিতিতে ৪১ জন সুবক্তা বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীর মাধ্যমে কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ সমস্যা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। এছাড়াও আরও ৬০০ জন কার্যকর্তা তাঁদের বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন ওই পথসভাগুলিতে।

বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন

গত ২৪ অক্টোবর সঙ্ঘের রামমোহন নগরের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কাঁকুড়গাছির জয়সোয়াল ভবনে। অনুষ্ঠানে ১৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। আবৃতি, নৃত্য ও কুইজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সু-সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। ওইদিনই সঙ্ঘের পূর্ব কলকাতা বিভাগের আরেকটি নগর লোকনাথ নগরে সঙ্ঘের তরফ থেকে বিবিধক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ষাট জন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিশিষ্ট প্রাণী-বিশারদ শিবাজী ভট্টাচার্য। রাষ্ট্রবন্দনা বন্দেমাতরমের মধ্য দিয়ে উভয় অনুষ্ঠানেরই সমাপ্তি ঘটে।

গত ১২ নভেম্বর কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ওইদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রী জগদ্‌বন্ধু মঠের শ্রী বন্ধুগৌরব মহারাজ। তিনি শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর ব্যাখ্যা করে সকলকে সম্মিলিতভাবে ধর্ম ও দেশের জন্য সচেতন হয়ে প্রীতি ও মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙেঘর উত্তর কলকাতা বিভাগ সঙঘচালক অজয় নন্দী, অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস, বিজেপি-র দেবব্রত চৌধুরী, পতঞ্জলী যোগপীঠের উৎপল সাহা, প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিতির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর হাওড়ার তাঁতিবেড়িয়াতে সমাজ সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। উক্ত শিবিরে ৩১ জন রক্তদান করেন।

সমাবেশ সমাচার

দিনহাটায় দুর্গাপুজো প্রশিক্ষণ শিবির

উত্তরবঙ্গ পুরোহিত মঞ্চে র পরিচালনায়, দিনহাটা কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় শ্যামাপদ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে রাধিকালাল পুরোহিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ১০ অক্টোবর যজমানসহ পুরোহিতদের দুর্গাপুজো সংক্রান্ত প্রশিক্ষণবর্গ অনুষ্ঠিত হলো। উল্লেখযোগ্য, যাঁদের বাড়িতে শারদীয়া দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় তাঁরাও এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দেবীপুরাণের মতে। এই প্রশিক্ষণবর্গ অনুষ্ঠিত হয় বর্ষীয়ান পুরোহিত প্রকাশ চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শিবির উদ্বোধন করেন গণেশ চক্রবর্তী। শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত কালিদাস ভট্টাচার্য, মহাদেব গোস্বামী, মদন আচার্য ও হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

প্রমোদতরণী এম ভি সর্বজয়ায় প্রতিবেদক শিবাশিস দত্ত। ছবি - সরিতা বসু

প্রমোদতরণী-তে দুর্গোৎসব

গঙ্গাবক্ষে একাধিক প্রমোদতরণীতে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছিল পশ্চি মবঙ্গ রাজ্য পর্যটন দপ্তর। মহাষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি বিস্তৃত ছিল এই বিনোদন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির আয়োজন। সকালে সর্বসাধারণের জন্য প্রবেশমূল্য ছিল পাঁচশো টাকা এবং সন্ধ্যায় সাতশো টাকা। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম মেকার্স ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিদিন প্রতিটি ট্রিপে একটি করে টিকিট বুকিং করে সিট রিজার্ভ করা হয়েছিল। চলন্ত স্টীমারে ভুরিভোজের সঙ্গে দুর্গাপুজো দর্শন করতে করতে দর্শনার্থীরা কখনও দেখেছেন গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্য্য, কখনও হুগলি ব্রীজ, কখনও নৃত্যরতা তনুশ্রীশঙ্কর ও তাঁর নৃত্য-তৎপর সম্প্রদায়কে, কখনও বা দেখেছেন আকাশজুড়ে লক্ষ লক্ষ টাকার আতসবাজীর প্রদর্শন।

সীমা-সংবাদ

গত ১৪ অক্টোবর সকালে আর এস এস এবং সীমা জনকল্যাণ সমিতির ১৫ জন কর্মী ভারত-বাংলাদেশ সীমা পরিদর্শনে যান। ইছামতী নদী থেকে তাঁরা গোটা দিন ধরে বাংলাদেশ সীমান্ত দর্শন করেন। তাঁরা নদীপথ থেকেই দেশের সীমা সুরক্ষা বল (বি এস এফ) সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী রাজনগর দ্বীপ, হাসনাবাদ ও টাকী-র গ্রামগুলিতেও জন-সম্পর্ক করেন। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে সীমা জনকল্যাণ সমিতির কর্মীরা রাখীপূর্ণিমার দিন রাখীবন্ধন উৎসবও পালন করেন মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থেকে সুন্দরবনের সোমেশ্বর নগর পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে।

ও দন্ত পরীক্ষা শিবির। শিবিরে বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাঃ অপূর্ব গুপ্ত প্রায় ৫০ জনের দন্ত পরীক্ষা করান।

শিবিরে উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসকরা ৬৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করেন। এছাড়া দুস্থ ছাত্রদের সহায়তা, সর্বসাধারণের জন্য প্রসাদ বিতরণ এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবাও ছিল পুজোর অন্যতম আকর্ষণ।

মঙ্গলনিধি

প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বাঞ্চ ল কল্যাণ আশ্রমের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি অধ্যাপক তারকনাথ দে তাঁর নাতি শ্রীমান অভীকের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাঁকুড়া সেবা ভারতীর সম্পাদক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

শোক-সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ গ্রামের ডাঃ বাদল চন্দ্র মণ্ডল গত ২ নভেম্বর রাত্রে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি স্ত্রী, একপুত্র ও একমাত্র নাতিকে রেখে গেছেন।

শিবিরের তত্ত্বাবধান করেন পরেশ চক্রবর্তী।

শিক্ষক-সম্মেলন

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙেঘর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন গত ৩ অক্টোবর বালুরঘাট শহরে প্রাচ্য ভারতী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সংগঠনের প্রাদেশিক সভাপতি ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাদেশিক যুগ্ম সম্পাদক অবনীভূষণ মণ্ডল, সহ-সম্পাদক বিষ্ণুপদ রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতি রামচন্দ্র বসাক, কার্যকরী সভাপতি রঞ্জন কুমার মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক বিমলেন্দু দাস ও আরও ৭ জনকে নিয়ে জেলা সমিতি গঠিত হয়। এছাড়া প্রতি খণ্ডের জন্য একেকজন শিক্ষক প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব নেন।

চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষা শিবির

পল্লীবাসীবৃন্দ ক্লাবের উদ্যোগে কাশী দত্ত স্ট্রীট সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোয় গত ১৪ নভেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত হলো চক্ষু

সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব

(৩ পাতার পর)

১৯৪৮ সালের স্মৃতি

সঙেঘর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ নতুন নয়। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের অজুহাত ছিল। হত্যাকারী নাথুরাম গডসে হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। হয়ত কোনও সময় সঙেঘর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ব্যস, অজুহাত তৈরী। সঙেঘর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। হিন্দু মহাসভা এবং সঙেঘর মধ্যে কোনও ফারাক থাকার কারণ নেই। দু'টি সংগঠনই হিন্দুদের বিষয়ে কথা বলে। সুতরাং সিদ্ধান্ত— দু'টোই এক। ওই সময় শ্রীগুরুজীকে গ্রেফতার করা হয়। ওঁর বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর অর্থ শ্রীগুরুজী গান্ধীজীর হত্যাকারী— অবশ্য দিন দুয়েক'এর মধ্যেই নিজেদের মুর্খামি বুঝতে পেরে সরকার শ্রীগুরুজীকে নির্যাতনমূলক আইনে আটক করে। আমার ধারণা গান্ধীহত্যা না হলেও সঙঘকে নিষিদ্ধ করা হতো। কারণ দেশ বিভাজনের অপরাধবোধ ক্ষমতাসীনদের বড়ই অস্বস্তিতে ফেলেছিল। আর ওই বিভাজনের শিকার লক্ষ লক্ষ আর্ত মানুষের সেবায় স্বয়ংসেবকরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিল।

সঙেঘর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে চলার জন্য ক্ষমতাসীনদের রাতে ঘুম অবধি ছুটে গেছিল। তাই সঙেঘর বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হলো। গান্ধী হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস আগে পাঞ্জাবে এক জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "সঙঘকে পিষে শেষ করে দেবো" (সঙঘকো কুচল দেঙ্গে)। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আগে উত্তর প্রদেশ সরকারের সংসদীয় সচিব গোবিন্দ সহায় সঙঘকে 'হিটলারের গান্ধীবাদ'এর সমার্থক বলে উল্লেখ করে সঙঘকে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সরকার সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে ছিল। নাথুরাম গডসের অবিবেচনা প্রসূত কাজ সরকারকে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ এনে দিল। হাজার হাজার স্বয়ংসেবককে নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেফতার করা হলো। হাজার হাজার কার্যকর্তার ঘর বাড়ীতে তল্লাশী চালানো হলো। সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চরম সীমায় পৌঁছাল— কিন্তু সঙেঘর বিরুদ্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ সরকার যোগাড় করতে পারল না। সঙেঘর কার্যালয়, স্বয়ংসেবকদের দোকান ঘরবাড়ীতে হামলা চালানো হয়। কিন্তু 'হিংসাচারী' সঙেঘর কার্যকর্তাগণ এই সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের পাল্টা হিংসাশ্রয়ী কোনও কাজ করেনি। নিজের দাঁত যেমন নিজের ঠোঁটকে কামড়ে দেয় তখন একজন সুস্থ সচেতন মানুষ যা করে সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে অশেষ সহ্যশক্তি পরিচয় দিয়েছিল সঙেঘর স্বয়ংসেবকরা। এরপর শুরু হয় এক (প্রকৃত অর্থে) অভূতপূর্ব সত্যাগ্রহ এবং শেষপর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

ভুলে যাও—ক্ষমা করে দাও—এগিয়ে চল

পরের অধ্যায় ১৯৭৫ সালে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সঙঘকে নিষিদ্ধ করলেন। ১২ জুন এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আনা ভ্রষ্টাচারের অভিযোগে তাঁর নির্বাচন বাতিল করে দেন। এক্ষেত্রে তিনি পদত্যাগ করে তাঁরই দলের জগজীবনরাম বা যশবন্ত চৌহানের মতো কোনও উপযুক্ত প্রবীণ ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করতে পারতেন। কিন্তু ন্যায়বোধ এবং সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতার উপর জয়ী হলো গদির মোহ এবং ২৬ জুন জরুরী অবস্থা জারি করে সারাদেশকে একটা জেলখানা বানিয়ে দিলেন। অসংখ্য লোককে জেলে ভরা হলো। জরুরী অবস্থা জারীর এক সপ্তাহের মধ্যে সঙঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কেন এমন করা হলো? সঙঘ তো ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করেনি। তাহলে নিষেধাজ্ঞা কেন? তাদের নিষিদ্ধ করা হলো না কেন? এর কারণ একটাই— সঙঘকে শেষ করে দাও। এই স্বৈরাচারী কাণ্ডে একটি কম্যুনিস্ট পার্টিও ইন্দিরাজীর সহযোগী ছিল। মনে হয় ইন্দিরাজী ভেবে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ যে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছেন তাকে সঙঘ সমর্থন করবে। কারণ যাইহোক সঙঘ নিষিদ্ধ হলো। অতি দ্রুততার সঙ্গে সঙেঘর কার্যালয় গুলিতে তল্লাশী চালানো হলো। এই তল্লাশীতে টিন ও কাঠের তৈরি তরোয়াল পাওয়া গেল। যথারীতি তার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। উদ্দেশ্য একটাই— জনমানসে সঙঘ যাতে একটি হিংসাশ্রয়ী সংগঠন রূপে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু লোককে বোকা বানানো, ভুল বোঝানো এত সহজ নয়। সঙেঘর শুরু নাগপুরে হওয়ার জন্য এবং ওই সময় (১৯২৫ খৃঃ) নাগপুরের ব্যায়ামশালাগুলিতে লাঠি, ভালা (বল্লম/বর্শী) তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তাই সঙেঘর শাখাতেও প্রথম দিকে এই ধরনের অস্ত্রগুলি প্রয়োগ প্রশিক্ষণই দেওযা হোত। তবে সঙঘ বহু আগেই (জরুরী অবস্থা জারীর) এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেয়। যদিও পুরানো টিনের ও কাঠের তরবারি সঙঘকার্যালয়ে পাওয়া যায়। সঙঘ হিংসাত্মক ঘটনার সাথে জড়িত থাকে একথা প্রমাণ করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী সরকারের কাছে ওই তরবারিই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। কিন্তু সঙঘ এই সঙ্কটও কাটিয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালে সঙেঘর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তৎকালীন সরসঙঘচালকের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? ঠ্গ্সক্তজঞ্চদ্বব্ধ ক্রুস্তু ন্দ্রগ্সক্তজঞ্চ্লন্দ্ব—ভুলে যাও ও ক্ষমা করে দাও। তিনি বলেননি 'বদলা নাও'। এই ছিল সরকার কথিত 'হিংসাশ্রয়ী সংগঠনের' প্রতিক্রিয়া যা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ড

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা, প্রধানত রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র সঙেঘর বদনাম করার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। মধ্যপ্রদেশের ঝবুয়াতে একজন খৃস্টান সন্ন্যাসীনিকে বলাৎকার করা হয় এবং এই ঘটনায় সঙঘকে অপদস্থকারী সংবাদ মাধ্যম কি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল? এদের একটাই কাজ সংঘের বদনাম করা। এরপর অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি চার্চ-এ হামলার ঘটনা ঘটে এবং এই ঘটনাতেও সঙেঘর নাম জড়ানো হলো। পরে জানা গেল একটি মুসলিম সংগঠন এই ঘটনায় যুক্ত— তাও চার্চেরই প্ররোচনায়। পরিণাম হলো সংবাদ মাধ্যম কিছু সময়ের জন্য সঙঘকে জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে নাম কিনল।

সম্প্রতি মালেগাঁও'এ একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে 'অভিনব ভারত' জড়িত বলে বলা হয়। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সন্ত্রাসরোধী বিশেষ আইন 'মকোকা' অনুসারে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যারা দোষী প্রমাণিত হবে তাদের শাস্তি হবে। গোয়াতে বিস্ফোরণ ঘটানো জন্য যে দুজনকে পাঠানো হয়েছিল আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ায় তারা নিহত হয় এবং জানা যায় তারা সনাতন সংস্থার সাথে সম্বন্ধিত— এজন্য সনাতন সংস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।

অভিনব ভারত এবং সনাতন সংস্থা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রূপে পরিচিত। এজন্য সরকারের প্রচলিত ফর্মূলা অনুযায়ী সঙঘকে জড়ানো হলো। সেই বস্তাপচা সিদ্ধান্ত— এই সংস্থাদু'টি যেহেতু হিন্দুত্ববাদী এবং সঙঘও হিন্দুত্ববাদী অতএব এদের মধ্যে নিশ্চয় যোগাযোগ আছে। আর এই ধরনের অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী সরকার যে এই সিদ্ধান্ত নেবে এটাই স্বাভাবিক। মালেগাঁও এর মামলার তদন্ত করা সময় জানা যায় আজমীড় দরগা এবং হায়দরাবাদ মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডে কারা জড়িত। এর মধ্যে একটা মামলায় দেবেন্দ্র গুপ্তা নামে সঙেঘর একজন ভূতপূর্ব প্রচারকের হাত আছে বলে জানা যায়। স্বভাবতই সন্দেহের তির সঙেঘর দিকে তাক করা হয়। এই মামলায় সঙেঘর প্রবীন প্রচারক অশোক বার্ষ্ণেয় এবং অশোক বেরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। এরপর দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এদের কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি।

আমার আবেদন

দু' সপ্তাহ আগে একটি স্টিং অপারেশনের খবর পড়লাম। তাতে সঙেঘর প্রবীণ প্রচারক এবং কেন্দ্রীয় কার্যকারিনী মণ্ডলের সদস্য শ্রী ইন্দ্রেশ কুমারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের স্ট্রিং অপারেশন আর্থিক সহায়তা এবং প্রশাসনিক সহায়তা ছাড়া হয় না এটা আমরা জানি। ইন্দ্রেশ কুমারের প্রতি বিদ্বেষের কারণ কি? আমি বুঝতে পারি না। তিনি মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে উপস্থিত থাকেন, এটাই কি কারণ! মুসলমানরা তো বিচ্ছিন্নতাবাদী, আর যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তারা তো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভোট ব্যাঙ্ক হতে পারে না এটাই সরকারের মত। সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে সরকার্যবাহের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সরঙঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাঁর একটি ভাষণে জানিয়েছেন সঙঘ ১৯২৫ সালে থেকে আইনানুগ পথেই তার কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। এক স্বাবলম্বী হিন্দু সংগঠনই সঙেঘর পরিচয়। কিন্তু সরকার যদি কোনও অছিলায় সঙেঘর সাথে কপট ব্যবহার করে তাহলে সঙঘ সর্বশক্তি দিয়ে সেই অপপ্রয়াসকে আটকাবে —এটাই আমার মতো অসংখ্য সাধারণ স্বয়ংসেবকের ধারণা। কি করা হবে তা সংঘের অধিকারীগণ ঠিক করবেন। আজ ১৯৩৮ সালের পরিস্থিতি নেই। আমার মতো বর্ষীয়ান স্বয়ংসেবকদের এইসব ভোগ করতে হয়েছে। তখন সরকার, জনতা, সংবাদপত্র সবাই সংঘ বিরোধী ছিল। সংঘ ঐ অগ্নিতুল্য ঘটনার মধ্য থেকে অগ্নি শুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ১৯৭৫ সালে সরকার সঙেঘর বিরোধিতা করেছে— কিন্তু জনতা সঙঘকে সমর্থন করেছে। সেন্সারশিপের জন্য সংবাদপত্র মৌন ছিল। তবে এখন ২০১০ সাল চলছে। সরকার কোনও অবিবেচনাপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে না এটা প্রত্যাশিত। ১৯৮৪ সালে কংগ্রেসী নেতাদের মদতে দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন অংশে শিখ বিরোধী হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটে। তিন হাজার শিখ ধর্মালম্বী মানুষ নিহত হন। সজ্জন কুমার, টাইটলার ইত্যাদি বড় বড় কংগ্রেসী নেতা এই ঘটনায় জড়িত ছিলেন। এই ঘটনাগুলিকে কোন্ সন্ত্রাসবাদ বলবেন? কংগ্রেসী সন্ত্রাসবাদী? নাকি সবসময় মহাত্মা গান্ধীর নাম উচ্চারণ করে 'অহিংস আতঙ্কবাদ' বলবেন? সঙেঘর উচ্চ পদাধিকারীগণ বলেছেন সঙঘ তদন্তকাজে সহায়তা করবে। এজন্য দুজন প্রবীণ প্রচারককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল। এরা আত্মগোপন করেনি— আজও তাঁরা সমাজের মধ্যেই রয়েছেন। সঙঘ নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ। এছাড়া সঙেঘর সঙ্গে বিশাল হিন্দুসমাজ রয়েছে। প্রয়োজনে এই সমাজ নিঃসন্দেহে সঙঘকে সহায়তা করবে। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে 'হিন্দু আতঙ্কবাদ'-এর নামে দেশের গরিষ্ঠ জনসমাজকে অপমান করার যে অবান্তর ও অবিবেচক চক্রান্ত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতাগণ একযোগে প্রতিবাদ করুন। 'হিন্দু আতঙ্কবাদ' এই শব্দাবলী প্রয়োগ করে হিন্দুদের লাঞ্ছিত করা কোনও কাজের কাজ নয়।

(লেখক নাগপুর থেকে প্রকাশিত মারাঠী দৈনিক 'তরুণ ভারত'-এর প্রাক্তন সম্পাদক এবং প্রবীণ লেখক এবং আর এস এস-এর প্রাক্তন প্রবক্তা।)

শব্দরূপ - ৫৬৩

মণিদীপা কুণ্ডু

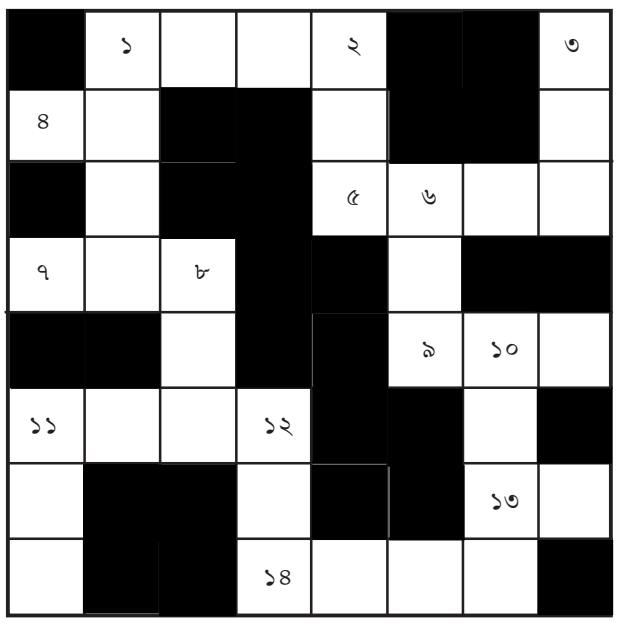

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. পূজনীয় ব্যক্তি, ৪. বঙ্গীয় কর্ক, ৫. রবিঠাকুরের কর্মফল গল্পে সতীশের মেসো, প্রথম দু'য়ে খরগোশ, ৭. মন্ত্রী ও তাঁহার অধিকারভুক্ত শাসন বিভাগ, ৯. তৎসম শব্দে লতাগৃহ, মধ্যে মন্দ, ১১. সূর্য, শেষ দুয়ে স্বামী, ১৩. এই ব্যাঙ কোনও গর্তে বাস করে বাহিরে বিশেষ যায় না, ১৪. ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা পূরণকারী দেবতরু।

উপর-নীচ ঃ ১. বাউলের একতারা বাদ্য বিশেষ, ২. ফারসি শব্দে লেখক, ইঙ্গ শব্দে নূতন শিক্ষার্থী, ৩. তৎসম শব্দে তুষার বা বরফ, শেষ দু'য়ে পরাজয়, ৬. দুর্যোধনের কূটবুদ্ধি মাতুল, ৮. তৎসম শব্দে ময়ূরপুচ্ছ, আভরণ, প্রথম দু'য়ে কদলী, ১০. মেয়েদের কপালে ফোঁটা দেওয়ার এক প্রসাধন বিশেষ, তিনে মন্দ, ১১. কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের অজ্ঞাতবাসকালীন নাম, ১২. বিশেষণে বিন্দুমাত্র, দু'য়ে-তিনে ইঙ্গ হ্রদ।

● ৫৬৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ ডিসেম্বর, ২০১০ সংখ্যায়

বিজ্ঞাপনের বেসাতি - আমাদের ধর্ম

নটরাজ ভারতী

মোষের ঘাড়ে দীর্ঘদিন জোয়াল চাপালে কাঁধ মোটা হয়। সূক্ষ্ম অনুভূতি হারিয়ে যায়। আমাদের মানে ভারতবর্ষের হিন্দুদের অবস্থাও তাই। প্রতিনিয়ত নানা মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে নিয়ে রীতিমতো ছাবলামো চলছে। আমাদের প্রতিবাদের ভাষা নেই। বাড়ির নিরাপদ ড্রয়িংরুমে বসে চুপচাপ হিন্দুধর্মের অপমান দেখছি। একমাত্র দাসজাতি'র এমন অবস্থা হয়। আমাদের কাজ কেবল সকাল সন্ধে ঠাকুরের থানে মাথা ঠোকা আর কপালে সিঁদুর চন্দন লাগানো। বাকি যা করার সে তো ঠাকুর করবে।

দাদু ঠাকুমার কাছে শুনেছি— একবালে যখন ডাকাতরা ডাকাতি করতে যেত তখন কালীপুজো করে তবে যেত। এখনও এমন প্রচুর কালীর থান আছে যার নাম ডাকাতে কালী। এখন আর সেই ডাকাতি নেই। কিন্তু তার ফর্মটা আছে। ছাত্র চললো পরীক্ষা দিতে। দু'পকেটে টুকলি। মাথা ঠুকছে ঠাকুরের কাছে। জাল ব্যবসায়ী থেকে ফাঁকিবাজ কেরানি সব এক অবস্থা। আর এই সামগ্রিক ফাঁকিবাজির জন্যই আমরা মাথা তুলতে পারছি না। যে যেমন পারছে লাথ মারছে। আমরা লাথগোরের জীবনযাপন করছি। অথচ আমাদের ঘরের দেয়াল জুড়ে দেবতার ছড়াছড়ি।

গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে সারা বাংলায় শিবভক্তদের কী দাপাদাপি— কী লাফালাফি। গেরুয়া হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জিতে যেন শিবের সাক্ষাৎ অবতার। বক্রেশ্বর তারকেশ্বর, মদনেশ্বর সব জায়গায় উপচে পড়া ভীড়। কাতারে কাতারে শিবভক্তের লাইন। সেই সঙ্গে বিকট চিৎকার—ভোলে বাবা পার করেগা, বোম বোম তারক বোম। কোথা পার করবে তার কোনও ঠিক নেই। এমন বহু বাবার ভক্তকে পাকিস্তান বাংলাদেশের সীমানা পার করে এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন এদেশে থেকেও যদি পার করে দেয় তখন বাবার ভক্তরা কোথায় যাবে তা জানা নেই। বাবার এইসব ভক্ত চিন্তা-চেতনায় বাঁজা। কিন্তু গাঁজা এদের সঙ্গী।

হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এখন একটি কোম্পানির বড় বড় হোর্ডিং। সেখানে লেখা— "পেলে কাড়ে গাবা— স্মার্ট হবেন বাবা"। সঙ্গে শিবের ছবি। লক্ষ লক্ষ শিবভক্ত ইটিছে রাস্তা দিয়ে। ধর্মতলার মোড় দিয়ে। এদের কারোও একবারও মনে হলো না এ তাদের আরাধ্য শিবের চরম অপমান। হিন্দু ধর্মের অপমান। শিব কি কাবলা নাকি যে তাকে ওই বিশেষ কোম্পানির মোবাইল ব্যবহার করে স্মার্ট হতে হবে। শিবভক্তদের উচিত ছিল তাদের বাবার ছবি দিয়ে টাঙানো ওই নোংরা বানার ছিঁড়ে ফেলা। প্রকৃত শিবের চ্যালা হলে তাই করতেন। দক্ষযজ্ঞের কথা মনে নেই। শিবের অপমানে দক্ষরাজার যজ্ঞস্থল তছনছ করেছিল শিবভক্তরা। তার চেলাচামুণ্ডারা যজ্ঞ পণ্ড করেছিল। অথচ এই সময়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বাবার ভক্ত বাবার অপমান সহ্য করছি। আর বাবাও যাতে রেগে না যান তার জন্য বাবার মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢালছি। বাবা আর মাথা তোলার সময়ই পাচ্ছেন না। শিবের নামে আমরা সুন্দর হচ্ছি না। গাঁজার ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে হিন্দু সমাজ।

বাংলা জুড়ে বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কম নয়। নানা রঙের নানা সাজের বৈষ্ণব। দিবারাত্র কৃষ্ণনাম করেন এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর। মন জুড়ে কৃষ্ণ আর দেহ জুড়ে সেবাদাসী এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর। চেতনার জায়গা শূন্য। এখন প্রতিদিন টিভির জনপ্রিয় চ্যানেলগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। একজন গেরুয়াধারী লোক প্রাচীন মধুর সুরে হরিনাম করছে। হঠাৎ এলো একটি বিশেষ কোম্পানির বিস্কুট। আর যায় কোথায়। ওই বিশেষ কোম্পানির বিস্কুট খেয়ে শুরু হয় বিকৃত চিৎকার। উদ্ভট সুরে গাওয়া শুরু হলো হরে কৃষ্ণ।

আমরা প্রতিদিন দেখছি। অগণিত কৃষ্ণভক্ত প্রতিদিন দেখছেন। হয়তো ওই বিশেষ কোম্পানির বিস্কুট টিবোতে টিবোতে দেখছেন। এইসব কট্টর কৃষ্ণভক্তের একবারও মনে হয় না তার আরাধ্য কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নামের এ চরম অপমান। এসব বন্ধ হওয়া দরকার। কৃষ্ণের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও আমাদের প্রতিবাদী করতো। মহাপুরুষ কৃষ্ণের কণামাত্র আশীর্বাদ আমাদের উপর থাকলে আমরা এমন হিজড়ের মতো আচরণ করতাম না। এটা দিনের পর দিন কিছুতেই চলতে দিতাম না। ধর্মের এই অপমান সহ্য করতাম না। হয়তো কোনও কোনও প্রবল কৃষ্ণভক্ত বলবেন, এসবই তেনার লীলা। গরম বাড়লে যেমন— কুটকুটি বাড়ে,ঘামাচি বাড়ে— তেমনই ভক্তির আতিশয্য বাড়লে— লীলার আস্ফালন বাড়ে। এ রাজ্যে বহু বড় বড় কৃষ্ণ নামের আশ্রম আছে, তারাও নীরব।

অপর একটি বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে গেরুয়া পোশাক পরে ধ্যান করছেন এক ঋষি, পাশেই এক যুবক এক বিশেষ কোম্পানির অন্তর্বাস পরে ধ্যান শুরু করে। দীর্ঘদিন গেরুয়া পরে ওই ঋষি ঈশ্বরের দেখা পায়নি। কিন্তু ওই বিশেষ কোম্পানির অন্তর্বাস পরে সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দেখা পেলেন। গেরুয়া পোশাক সেই কোন অনাদিকাল থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক। সারা বিশ্বে হিন্দুত্বের প্রতীক গেরুয়া। আমাদের একবারও মনে হয় না— গেরুয়ার এই চরম ও চূড়ান্ত অপমান হিন্দুত্বের অপমান। আমরা টিভিতে দেখি আর মজা পাই। একবারও মনে হয় না এগুলি নিছক অনুর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত নয়— এগুলি এক বড় চক্রান্তের অংশ।

শুধুমাত্র এই ক'টি বিজ্ঞাপন নয়— অহরহ নানা ভাবে হিন্দুত্বকে অপমান করা হচ্ছে। বৈষ্ণবদের আক্রমণ করা হচ্ছে। সবই হচ্ছে সংস্কৃতির স্বাধীনতার নামে। আমরা একবারও প্রশ্ন তুলছো না এগুলো যদি সংস্কৃতির স্বাধীনতা হয় তাহলে অন্য ধর্মের বিষয় নিয়েও এমন হয় না কেন? হজরত মহম্মদ বা যীশুখৃষ্ট একটি বিশেষ কোম্পানির অন্তর্বাস পরতেন এটা দেখানো সম্ভব কি? রোজার শেষে একটি বিশেষ কোম্পানির বিস্কুট খেয়ে রোজা ভাঙছে নামাজীরা। এগুলো হবে না। যারা হিন্দুধর্মকে অহরহ আঘাত করেন তারাও জানেন খৃষ্টান অথবা ইসলাম ধর্ম নিয়ে কিছু করলে পেঁদিয়ে মক্কা দেখিয়ে দেবে। ব্যবসা লাটে উঠবে। তাই আক্রমণ শুধু হিন্দুধর্মকে। আমরা একটা প্রতিবাদ করতেও পারি না। ওই সব পণ্য বয়কটের ডাক দিতে পারি না। শিবভক্ত হোক বা কৃষ্ণভক্ত সবাই কিন্তু হিন্দু। এই সত্যটা মনে রেখে এবার পথে নামা দরকার।

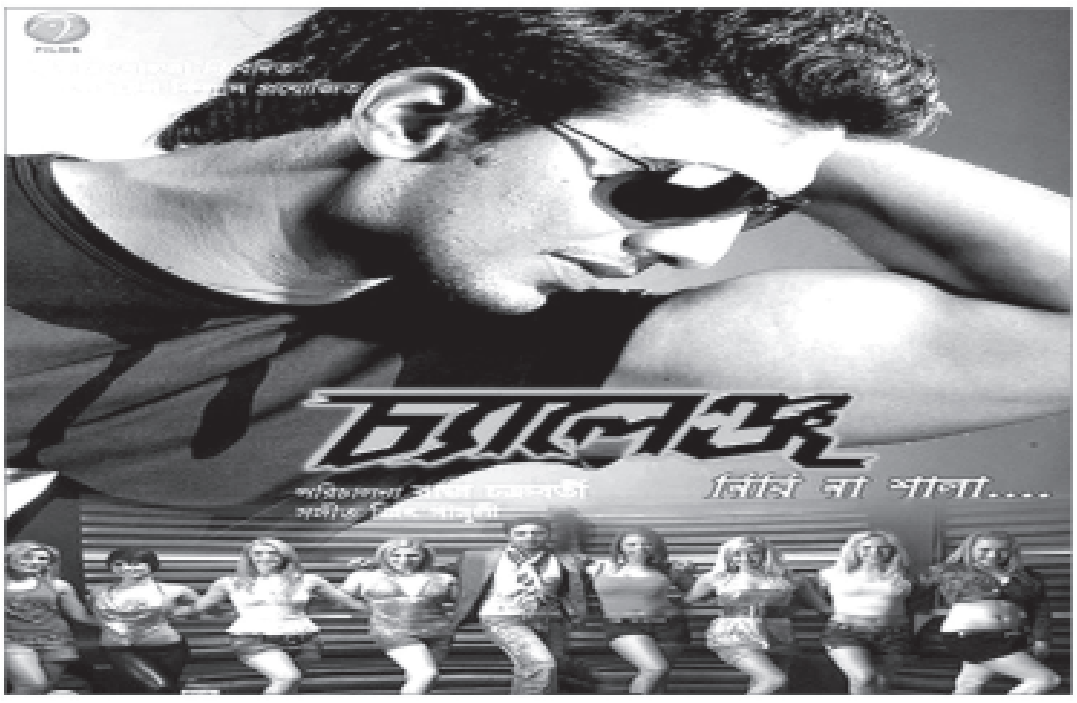

'কৃষ্ণ করলেই লীলা আমরা করলেই বিলা'– চ্যালেঞ্জ ছবিতে কৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমলীলার কটাক্ষ করতে নক্কারজনক ন্যাবলামি– প্রায় নগ্নগাত্র নারীদের সঙ্গে নায়কের উদ্দাম নৃত্য। কৃষ্ণপ্রেমী বঙ্গ-সমাজ তবু নীরব।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিশুমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "কল্যাণ আশ্রম বনবাসী, জনজাতিদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়ে নিয়ে তাদের চেতনা জাগিয়ে তুলতে চায়। সেবাকাজ তো অনেকেই করছে, কিন্তু এখানেই কল্যাণ আশ্রমে সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য। কল্যাণ আশ্রম বনবাসীদের স্বকীয় ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে। বনবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে ১৯৫২ সাল থেকেই।" উপরের কথাগুলি বলেন, অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রয়ের সর্বভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখ গজাননরাও বাপট। তিনি গত ১৪ নভেম্বর সোনাখালী (৭নং হেতুলতলা) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র-যুবদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শিশুদের সঙ্গে গজানন বাপট।

এখানে উল্লেখ্য, ওইদিন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত সম্প্রতি শুরু হওয়া এগারোটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে সহজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে প্রায় তিনশত অভিভাবক, অভিভাবিকা ও ১২০ জন শিশু-বালক-বালিকা উপস্থিত হয়েছিলেন। সল্টলেক কলকাতা থেকে শ্রীমতী উমা গোয়েল (যুব সমিতির তত্ত্বাবধায়ক) এবং উষা আগরওয়ালের নেতৃত্বে রিজার্ভ বাসে ২৪ জন মা-বোন সহ ৩৬ জনের একটি দল মেলাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয় সবাই তাঁদেরকে স্বাগত জানান। তারপর শুরু শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। গজানন বাপট, মহাদেব গড়াই, মথুরা সিং সর্দার সহ অন্যান্যরা শিশুদের পুরস্কার ও পারিতোষিক প্রদান করেন। সল্টলেক সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে বিস্কুট-চকোলেট উপহার দেওয়া হয়। এগারোটি বিদ্যালয়ের জন্য এগারোটি প্যাকেট দেওয়া হয়— তার মধ্যে খাতা, থাতা, পেনসিল, স্লেট, বল ছাড়াও মগ-বালতির মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও ছিল। সবশেষে সহভোজন— খিচুড়ি ও চাটনি সকলে সানন্দে গ্রহণ করেন। স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু-মিলন-মন্দির এবং সোনাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিতল বাড়ি, মাঠ ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষরা।

সবকিছু মিলিয়ে নগরবাসী ও বনবাসী জনজাতিদের এক মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল এই শিশুমেলা। বাসে যাতায়াতের পথে জলযোগের ব্যবস্থা করেন গজরাজ গোয়েল, বাসুদেব গোয়েল এবং বিমল মল্লাবত।

Swastika
22 November - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

আর এস এসের বিরুদ্ধে কুৎসা

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে রাজ্যের জেলায় জেলায় ধর্না

শিলিগুড়ির ধর্নায় রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

খড়্গপুরে অমনদাসজী বক্তব্য রাখছেন।

হাওড়ায় বক্তব্য রাখছেন তথাগত রায়।

হাজরায় ধর্নায় সামিল জনসাধারণ।

নদীয়ায় সহ জেলা কার্যবাহ গৌতম পাল ভাষণরত।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে ধর্না।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৪৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৩০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com